আনিসুজ্জামান

আনিসুজ্জামান

ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য

কারিগর

আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০)

আনিসুজ্জামান

প্রথমা

গত ১৪ মে ২০২০ প্রয়াত
বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শিক্ষক
আনিসুজ্জামানকে শ্রদ্ধা জানাতে
২৩ জুলাই ২০২০ 'হরপ্পা'-র পক্ষ থেকে
এই বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশিত হল

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহযোগিতা
ভূঁইয়া ইকবাল, দীপঙ্কর দাশ,
রেজাউল করিম সুমন ও সৌম্যদীপ

সম্পাদক
সৈকত মুখোপাধ্যায়

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ প্রাবন্ধিক শিক্ষক আনিসুজ্জামানের ‘ইহজাগতিকতা’র অবসান ঘটল গত ১৪ মে ২০২০। সাঙ্গ হল তাঁর ইন্দ্রিয়গোচর ও যুক্তিগ্রাহ্য জগৎ এবং জীবন-মৃত্যুর সীমায় আবদ্ধ অস্তিত্ব সম্পর্কে যাবতীয় উৎকণ্ঠা। পরলোক-পরকাল কিংবা অতিপ্রাকৃত অথবা আত্মায় তাঁর চিন্তায় কোনো প্রশ্রয় ছিল না। কারণ তিনি চোখ

খুলে দেখায় বিশ্বাসী ছিলেন, চোখ বন্ধ করে দেখায় নয়। অতিপ্রাকৃতকে নির্ভর করে কখনোই দুনিয়াকে বশীভূত করতে চাননি তিনি, কাজের মাধ্যমে সৎকর্মের মধ্যে দিয়ে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী ও সহনাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছেন আজীবন। ইহজীবন ছিল তাঁর

কর্মের এক এবং একমাত্র চারণভূমি, মনোরথের ঠিকানা। তাই তিনি ছিলেন সুখদুঃখ-বিরহ-মিলন-পরিপূর্ণ মানবজীবনের সাধক। সে-জীবনে তাঁর নিজের জগৎ, ছোটোখাটো চাওয়াপাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্নতা ছিল কম, যাবতীয় চিন্তা উদ্‌গ্রীব উচাটনতা সদাজাগরূক সচেতনতা ছিল পারিপার্শ্বিক বিশ্ব ও তার নাগরিকদের কেন্দ্র করে।

মানবজীবনকে দুঃসময় জ্ঞান না-করে তিনি সে-জীবনে সুখের সন্ধান করায় বিশ্বাসী ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মানবতার জয়গানে আস্থাশীল। আস্থা রাখতেন সাংস্কৃতিক বহুত্বে, আর এই বিশ্বাসের বলে তিনি কখনোই অন্য সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেন না, বরং সে

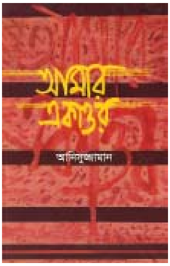

বহুত্ব ক্ষুণ্ণ হলে আঘাত পেয়েছেন বারবার। তাই আজীবন প্রচার করেছেন: "মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর সংস্কৃতিকে যেন আমরা যথাযথ মর্যাদা দিই; অন্যদিকে এক ধর্মসম্প্রদায় যেন অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের ওপর প্রাধান্য বিস্তার না করে।" ('সাংস্কৃতিক বহুত্ব', *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য*, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৩৮)।

ধর্ম বাঙালির সংস্কৃতির একটি উপাদান মাত্র। স্বভাবতই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর সাংস্কৃতিক বহুত্বের বিশ্বাসে আঘাত লেগেছিল বলেই তিনি ব্যক্ত করেন: "নিজের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা খুইয়ে আমি যেমন দুঃখিত, তেমনি ভারতে হিন্দুত্বের জাগরণে আমি ভীত।" ('সাংস্কৃতিক বহুত্ব', *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য*, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৩৯)।

আবার বাঙালির সংস্কৃতি উচ্চ ও নিম্নবর্গের ভিতর এক নয়, ধর্ম ও অঞ্চলভেদে আলাদা হলেও অন্তর্লীন একটি বন্ধন আছে—তাই তাঁর মনে হয়েছে, "[...] ধর্মভেদ ও শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও বাঙালি সংস্কৃতিতে সহজ সরল মানবিকতার প্রাধান্য আছে পূর্বাপর। এই মানবস্বীকৃতি, এই মানবপ্রাধান্য, বাংলা সংস্কৃতির একটা বড়ো গৌরব।" ('বাঙালি

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে’, *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য*, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৭৩)

বাঙালির এই আত্মপরিচয় লাভের জন্য বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল এক অগ্রণী পদক্ষেপ, যে-সংগ্রামে আনিসুজ্জামান ছিলেন একজন প্রথম সারির সৈনিক।

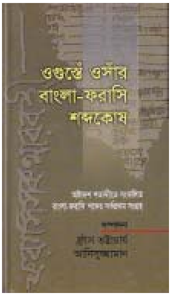

শুধু বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে উত্থানের তিনি সাক্ষী নন, তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশও। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বঙ্গদেশে কলকাতা শহরের এন্টালিতে (৩১ ক্যান্টোফার লেনে) জন্ম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামানের। তাঁর শিক্ষার শুরু পার্ক সার্কাসের একটি স্কুলে। তারপর তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস শুরু করেন এবং প্রথমে খুলনা ও পরে ঢাকায় তিনি শিক্ষালাভ করেন।

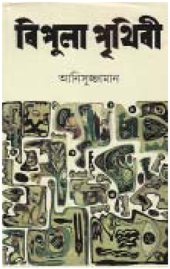

কিন্তু নতুন দ্বিখণ্ডিত রাষ্ট্র গঠিত হলেও কোনো প্রকারে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘাত শুরু হয়। যার প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। এই

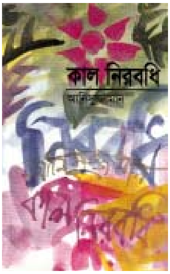

আন্দোলনের সামনের সারির একজন হিসাবে আনিসুজ্জামান রচনা করলেন *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কী ও কেন?* শীর্ষক পুস্তিকা। তখনও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেননি। এরপরের বছর ১৯৫৩-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করার পর থেকে আমৃত্যু কোনো-না-কোনোভাবে সে-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত থেকেছেন আর নিরন্তর সন্ধান করে গেছেন বাংলা ও বাঙালির স্বরূপ। এর ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে আলোকিত বহু মূল্যবান রচনা—কখনও পুস্তকাকারে, কখনও-বা গবেষণা-সন্দর্ভ রূপে, কখনও বক্তৃতায়, আবার কোনো সময়ে পত্রপত্রিকার দু-মলাটের ভিতর। স্বীকৃতি-সম্মাননাও তিনি পেয়েছেন অজস্র।

তবে শুধু সাহিত্যসৃষ্টির বৃত্তে তাঁর পরিচয়কে আটকে রাখলে ভুল হবে, তিনি ছিলেন মুক্তমনা, অবিচারের বিরুদ্ধে সদাপ্রতিবাদী এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। বংশপরম্পরায় তিনি পেয়েছিলেন নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী চলবার শিক্ষা। ব্রাহ্মপরিবারে মানুষ হয়েও তাঁর পিতামহ আবদুর রহিম যেমন নিজের ধর্মীয় সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করেন, তেমনি কোনো পরিস্থিতিতে চাপের কাছে নত

হয়ে আনিসুজ্জামান হারাননি তাঁর প্রতিবাদী সত্তাকে। প্রথম জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আনিসুজ্জামান যখন নানা প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডে মুখর তখন তাঁর "আব্বার কোনো সাংবাদিক-লেখক বন্ধু আমার [আনিসুজ্জামান] সম্পর্কে তাঁর কাছে এই বলে অনুযোগ করেছিলেন যে,

অমন ব্যক্তির [ইসলাম-বিষয়ক গ্রন্থাদির প্রণেতা আবদুর রহিমের] পৌত্র হয়েও আমি বিপরীত পথে অগ্রসর হচ্ছি। আব্বা তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখেন, আমার বাপ ব্রাহ্ম পরিবারে মানুষ হয়ে ইসলাম-বিষয়ে লিখতে পেরেছিলেন এবং

নিজের বিবেক-অনুযায়ী চলেছিলেন। তাঁর পোতা [পৌত্র] হয়ে আমার ছেলে যদি নিজের বিচারবুদ্ধি-অনুসারে চলতে চায়, তাহলে আমি তাকে বারণ করতে পারি না'।" (*কাল নিরবধি*, ঢাকা, পৃ ১৬)

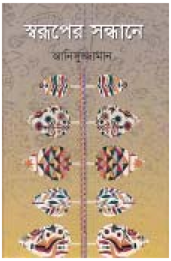

শুরু থেকেই পার্থিব বৃত্তের মধ্যে জীবনকে গণ্ডিবদ্ধ না-রেখে, তিনি সকল মত-ধর্মের ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এক 'ইহজাগতিক' বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ফলস্বরূপ পেয়েছেন বহুমানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ কোনো পরিস্থিতিতেই রুদ্ধ করা যায়নি।

এমনই এক ব্যক্তিত্বের তিরোধানে এই পুস্তিকাটি করোনা বিধ্বস্ত লকডাউন সময়ে 'হরপ্পা'-র একটি ক্ষুদ্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। প্রাথমিকভাবে কথাশিল্পী মিহির সেনগুপ্ত-র লেখাটি দিয়ে এই পুস্তিকার গ্রন্থনার কাজ শুরু হলেও ধীরে-ধীরে সংগৃহীত হয়েছে আরও বেশ ক-টি লেখা। এই উদ্যোগে দূরত্ব বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি লেখকদের আন্তরিকতা ও তাঁদের আনিসুজ্জামানের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার কারণে—আমাদের তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। গোলাম মুরশিদের নিবন্ধ 'আমার শিক্ষক আনিসুজ্জামান' লেখকের অনুমতিক্রমে পুনঃপ্রকাশ করা

হল (প্রথম প্রকাশ https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/61334, ১৫ মে, ২০২০, ‘মতামত’)। পরিশেষে উল্লেখ করতে হয়, বিশিষ্ট গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল, বাতিঘর-এর প্রাণপুরুষ দীপঙ্কর দাশ ও ‘নির্মাণ’ পত্রিকা-সম্পাদক রেজাউল করিম সুমনের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই বৈদ্যুতিন পুস্তিকাটি সার্থক রূপ পেত না।

আশা রাখি, আনিসুজ্জামানকে নিয়ে স্মরণ-সম্মাননা ও গবেষণা চলবে—তবে এই সংকটসময়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে তাঁর দেখানো পথে অগ্রসর হওয়াই হবে তাঁর প্রতি আমাদের সব থেকে বড়ো শ্রদ্ধার্ঘ্য—“কথা ফুরোয় না, সময় ফুরিয়ে যায়। লেখার ছেদ টানা যায়, জীবন কিন্তু প্রবহমান।। জীবন ক্রমাগত সামনের দিকে চলে। আমাদের পথচলা এক সময়ে থেমে যায়, জীবন থামে না।” (*বিপুলা* পৃথিবী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ ৫১৮)

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ‡ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৭

একজন ঐহিক তীর্থংকর যেমন দেখেছি ‡ মিহির সেনগুপ্ত ১৯

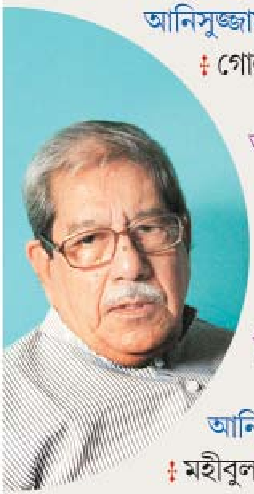

আনিসুজ্জামানের গবেষণা ও জীবনাদর্শ
‡ গোলাম মুস্তাফা ৪১

আমার শিক্ষক আনিসুজ্জামান
‡ গোলাম মুরশিদ ৭৯

একটি চিঠি ‡ ভূঁইয়া ইকবাল ৮৯

বিদ্বান আনিসুজ্জামান ‡ আহমদ কবির ৯৩

আনিসুজ্জামান এবং একটি ধ্রুপদি গ্রন্থ
‡ মহীবুল আজিজ ১০৫

বাঙালির সংস্কৃতি: অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের
বক্তব্য নিয়ে কিছু কথা ‡ আখতার হোসেন খান ১২৩

আনিসুজ্জামান: শিক্ষকতা সাহিত্যিকতা ও সামাজিকতা
‡ আহমাদ মাযহার ১৩১

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

দুর্ব্বল কর্ত্তব্যজ্ঞান... অলস ও অকর্ম্মণ্য অস্বাভাবিক ভাব প্রবল (ভাবপ্রবণ?) ও কলুষিত হই... পড়ে।"

উপন্যা... পক্ষ... করতে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে গোলাম মো... ছিলেন ...ন। তাঁর মতে, "উপন্যাস দ্বারা রুষিয়ার জাতীয় জী... সঞ্জীবিত ...ইয়াছে। উপন্যাস দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনস্রোত অ... ...াইয়া দেওয়া হইয়াছে।" বলা বাহুল্য ... গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে লেখকের জীবনদর্শন ও র... ...সামাজিক ভূমিকার উপরে। 'সওগাতে' আবুল কালাম শামসুদ্দী... ...ব্যর্থই অভিযোগ করেছিলেন যে, "এখনো বাঙ্গালী মুসলমান কাব্য... ...াদনে অভ্যস্ত নহেন, নৈতিক উপদেশের গভীর নিনাদে তাঁহাদে... ...র্ণ বধির হইয়া আছে, কাব্যের মধুর ঝঙ্কার এখনো তাঁহাদের কর্ণে ...শলাভ করে নাই।"

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা ... ...লমানের সৃষ্ট ...হিত্যের শিল্পমূল্যের আলোচনায় প্র... ...া করে সাধারণ... ...র আমাদের সমা... ...া মুসলমান সমাজের স... সেই সাহিত্যের সম্প... ...র্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ...ন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র, ...নাথ শাস্ত্রী, ...ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ... বিদ্যাবিনো... ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ রচনা তাঁদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ...সব রা... ...র চিত্র ও চরিত্র মুসলমানের মর্যাদাহানি করেছে, এই ছিল তাঁদের অভি...। ...পরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার উল্লেখ করে মোহাম্মদ ... ...তউল্লা দেখান যে, তাঁরা মুসলমানের গুণকীর্তনও করেছেন। রবীন্দ্রনা... ...মর্থনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ— "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ"—লেখেন ... ...ম মোস্তফা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। এখানে ... বলেন যে, 'গীতাঞ্জলি'তে ইসলামী ভাবধারা এত চমৎকা... ...ফুটে ... মুসলমান কবিদের রচনায়ও দেখা যায় না। তাঁর মতে ...গীতাঞ্জলি'র প্রথ... ...বিতাতেই "ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হ... ...ছে" এবং জীবন ... ...কৃতি সম্বন্ধে ধারণায়, সাম্যবোধে ও বিশ্বপ্রেমে রবীন্দ্রনা... ... বাণীই ... ...াশ করেছেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ প্রবন্ধপাঠে আনন্দপ্রক... ...করে সম্পাদককে পত্র দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'মোহাম্মদী'র অভিমত ... ...উল্লেখযোগ্য:

"পার্সী ও উর্দ্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ... অনেক কবি গীতাঞ্জলীর সাধ্য-সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরে... ...ন ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এবং মধুরতর রসসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়... ।"

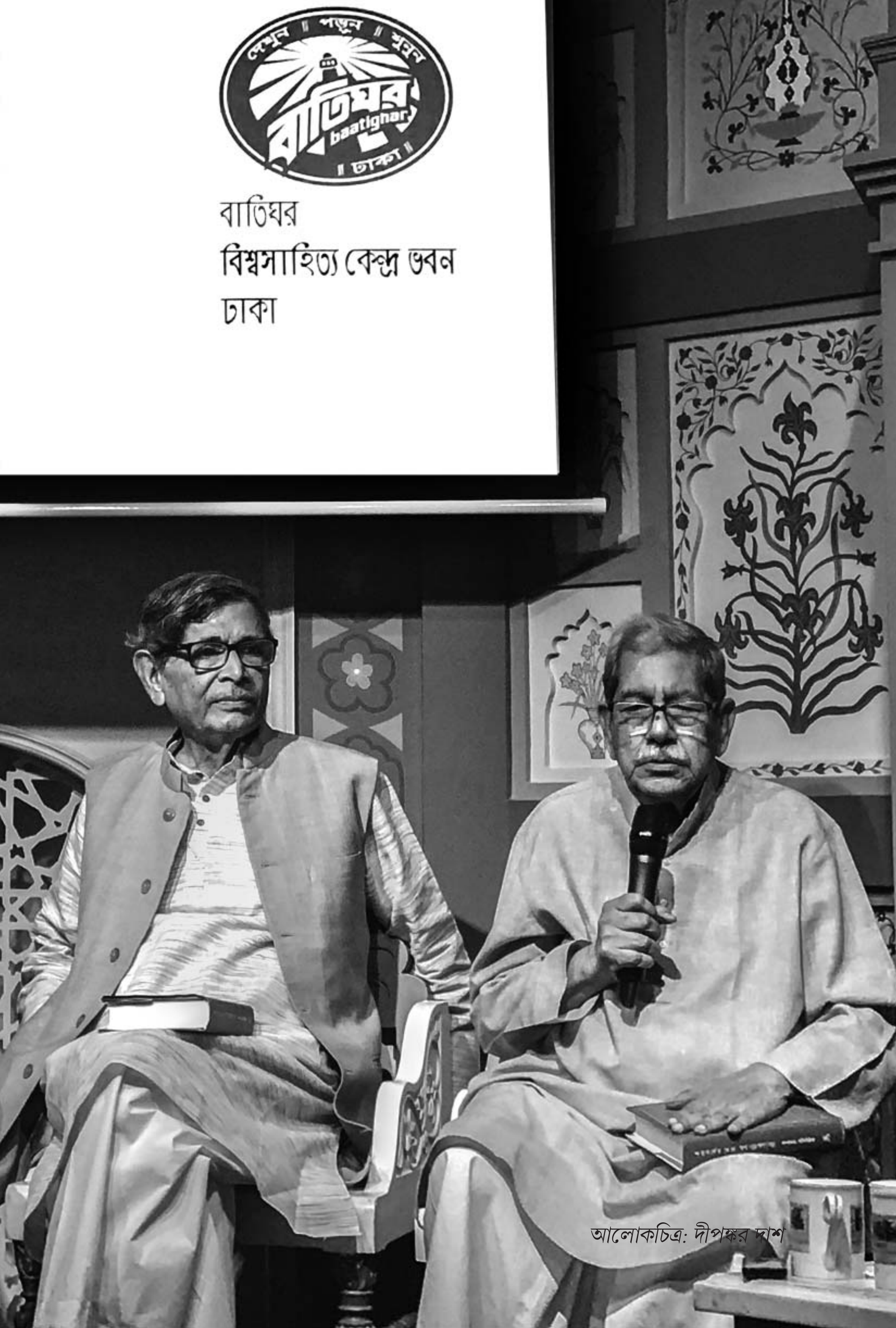

আলোকচিত্র: দীপঙ্কর দাশ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সুস্মিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী সজ্জন মানুষ ছিলেন। চরিত্রের এই স্মিত মাধুর্য দিয়ে তিনি সবার প্রিয়তা পেয়েছিলেন। আমরা হাসাহাসি করে বলতাম: তাঁর শত্রু হওয়া যেমন কঠিন তেমনি কঠিন তাঁকে শত্রু বানানোও। তাঁর মধ্যে কয়েকটি অনন্য বৈপরীত্য ছিল। তিনি পড়াশোনা করেছিলেন অনেক, কিন্তু রাশভারী পাণ্ডিত্য দিয়ে পৃথিবীকে ভয় দেখাননি। তিনি সবসময় প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে থেকেছেন, কিন্তু কখনো নেতা হতে চেষ্টা করেননি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিয়ে তিনি হয়েছিলেন আমাদের পান্থজনের সখা। বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস আর চরিত্রের স্নিগ্ধ ভারসাম্য দিয়ে তিনি তাঁর চারপাশকে মাধুর্যে ঘিরে রাখতেন। যে অল্প ক-জন দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশকে আলোকিত করে রেখেছিলেন তিনি তাঁদের একজন।

লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা।

যে-জগৎ ইন্দ্রিয়গোচর ও
যুক্তিগ্রাহ্য এবং যে-জীবন জন্ম ও মৃত্যুর
সীমায় আবদ্ধ, সেই জগৎ ও জীবন
সম্পর্কে উৎকণ্ঠাকেই বলা যায়
ইহজাগতিকতা।
জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এ এক সম্পূর্ণ
দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরলোক ও
পরকাল সম্পর্কে কিংবা অতিপ্রাকৃত ও
আত্মা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রশ্রয় পায়
না। পৃথিবী ক্ষুদ্র হোক আর বিপুলা হোক,
জীবন পদ্মপত্রে নীর হোক আর
জীবকোষের সমাহার হোক, এই
পৃথিবীতে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পরিপূর্ণ
মানবজীবনের সাধনাই ইহজাগতিকতার
মূল কথা।

মিহির সেনগুপ্ত

একজন ঐহিক তীর্থংকর যেমন দেখেছি

এক

“সর্বে ক্ষয়ান্তানিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্।। ”
(*মহাভারত - স্ত্রী পর্ব*)

“সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।” কিন্তু দার্শনিক কোনো তত্ত্ব আলোচনা উত্থাপনের জন্য এই লেখাটির অবতারণা করছি না। তথাপি উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটির অমোঘ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলাম না। যাঁর বিষয়ে দু-একটি স্মৃতি

উদ্ধারকল্পে এই লেখাটির প্রচেষ্টা। তিনি আদৌ কোনোরকম ভাববাদী দর্শনে, কোনো সময়েই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রস্থান নিতেন না। তাঁর আজীবনের তত্ত্ব সবটাই ইহজাগতিকতা সমৃদ্ধ। তবে একবারের কথা মনে আছে, সম্ভবত সেটা ২০১১-১২-র ঘটনা।

তপন রায়চৌধুরী

তাঁর প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসঘরে আমার সুযোগ হয়েছিল ঘণ্টা দুয়েকের মতো একাকী আড্ডা মারার। সে-বিষয়ে পরে কার্যকারণটা যথাসংক্ষেপ বলব। তপন রায়চৌধুরীর কাছে শুনেছিলেন, আমার *বিদুর* নামক বইটির সাহিত্য সংসদ সংস্করণটি পাঠযোগ্য হয়েছে। তপনদা বলেছিলেন, আনিসের কাছে গেলে, ভালোমন্দ সব বই-ই নিয়ে যাবে। *বিদুর* আমার কাছে ছিল না। ঢাকার তক্ষশীলা থেকে এক কপি বই কিনে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "*মহাভারত* আমার প্রিয় গ্রন্থ। তার অনেক-অনেক মহৎ শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক প্রায়শই আমাকে আমার অভ্যস্ত চিন্তার বাইরে ভাবায়। অবশ্য আমি মিথোলজির খুব ভক্ত নই।" জানতে চাইলাম, "শ্লোকটি কী?" বললেন, "ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্য কুরুসোত্তম। ন মধ্যস্থ ক্বচিৎ কালঃ সর্বং কালং প্রকর্ষতি।।" বললাম, "শ্লোকটি আমারও খুবই প্রিয় এবং এ বইটিতে আছেও। কিন্তু আপনার ইহজাগতিক চিন্তাধারার সঙ্গে এই তত্ত্বের সংগতি কি মেলে?"

—"এ অনেক দীর্ঘ বিতর্ক। সময়-সুযোগ হলে, পরে একদিন দীর্ঘ আলোচনা করা যাবে।" বলা বাহুল্য, সে-সুযোগ

আর হয়নি। তবে সেদিনই তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “এই শ্লোকে ইহজাগতিকতা যতটা পরিস্ফুট, তার ভাববাদী বা ধর্মমূলক অর্থ তার ধারেকাছেও যায় না।

আনিস ভাই বা আনিসদাকে যতটা চিনি বা দেখেছি, তা-তে তাঁকে বরাবরই মিছিলের সামনেই দেখেছি। সেসব জীবনসংগ্রামের লড়াকু মিছিল। আজ যখন গোটা বিশ্ব এক অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মিছিলে পথ চলছে, সেই মিছিলেও তিনি থাকবেন সে-কথা কি ভেবেছিলাম?

একেবারেই ভগ্নহৃদয়ে এই লেখা লিখছি। আমি যে-মাপের মানুষ, আমার পক্ষে তাঁর মতো মানুষের একশো হাত দূরত্বের মধ্যেও থাকার কথা নয়। তথাপি তাঁর অপার স্নেহছায়ায় কীভাবে এসে পড়েছিলাম মূলত সেই কথাগুলো বলব বলেই এই লেখা লিখছি। ব্যাপারটা এমন নয় যে আমিই একমাত্র সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যে তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি ছিল আকাশ বা সমুদ্রতুল্য, যেখানে অগণিত মানুষ আশ্রয় পেয়েছে।

জাহানারা ইমাম

আনিস ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় সম্ভবত ১৯৮৮-তে, বন্ধুবর আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের মাধ্যমে তাঁর টিকাটুলির বাসায়। সালটা ১৯৯২-ও হতে পারে—সঠিক মনে নেই। তবে সেদিন শহিদ-জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক-দালাল নির্মূল সমিতির একটা বেশ বড়োসড়ো সভা হয়েছিল। আমরা তিনজন সেদিনের প্রবল বর্ষণ এবং

পুলিশি তাণ্ডবের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে শহিদ-জননীর বক্তৃতা শুনেছিলাম। শহরের অবস্থা খুবই ভয়াবহ ছিল বলে তাঁরা দুজনেই একটা সিএনজি করে আমাকে আমার আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমাকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে ওই সিএনজি-তেই ফিরে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সেবার শুধু দেখাই হয়েছিল, আলাপপরিচয় হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে আনিস ভাইয়ের কথা আমি জানতাম। আবদুল হক নামে আমার এক বন্ধু ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসে কাজ করতেন। সেই-ই আমাকে তখনকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিষয় অবগত করায়। তাজউদ্দীন আহমদ তখন ওই সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং আনিস ভাই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। হকের মুখেই এসব কথা আমি শুনেছিলাম। দূর থেকে কয়েকবার তখন তাঁকে দেখেছি। তখন তাঁর অল্প বয়স, মাত্র ৩৪ অতিক্রম করেছেন কি করেননি। দোহারা চেহারা, সুন্দর সুপুরুষ গড়ন। হক বলেছিলেন, অসামান্য মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এখন নামকরা অধ্যাপক। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এ পাকিস্তান বিরোধী গণ অভ্যুত্থানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম বিখ্যাত সৈনিক এবং সুলেখক এখনকার

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতার মুকুলের কাছে আনিস ভাইয়ের অনেক কৃতিত্বের কথা শুনেছিলাম ১৯৯২-তে, সেসব প্রায় আনিস ভাইয়ের শিক্ষাবিদ হিসেবে এবং গণআন্দোলনের প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে রূপকথার মতো কাহিনি।

এম আর আখতার মুকুল

কিন্তু এই সব কথাই দূরের থেকে অন্য মানুষের মুখে শোনা কথা। তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতায় সংযোগ ঘটেছিল ১৯৯৬-এর মার্চ কি এপ্রিলের কোনো একটা সময়। এই সময়, একদিন রাতে তপনদা তাঁর কলকাতার সাময়িক অবস্থানের বাসা থেকে আমাকে ফোনে বললেন,“মিহির, বাংলাদেশ থেকে ডক্টর আনিসুজ্জামান এসেছেন। তোমার কথা ওঁকে বলেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। কাল চারটের মধ্যে পিয়ারলেস ইন-এ ওঁর সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার প্রকাশিত সব ক-টি বই অবশ্যই ওঁকে দিয়ো। ওঁর ফ্লাইট কিন্তু সন্ধে ছ-টায়।”

তপনদাই বলেছিলেন, “তোমাদের বন্ধুটি এবার আনন্দ পুরস্কার পাচ্ছেন।'' বস্তুত, ইলিয়াসদা আনন্দ পুরস্কারটা গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তরুণ (পাইন) এবং আমি, ইলিয়াস-দার প্রচণ্ড ঢাকাই-কুট্টির সংলাপে অজস্র খিস্তি-খামার সহ্য করেও সেঁটে ছিলাম।

এরকম একটা সময়ে আনিস ভাই গিয়েছিলেন ইলিয়াসদাকে বোঝাতে। ইলিয়াসদা তাঁর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তথাপি গুরু

আজ্ঞা পালন করলেন না। আমি নির্ধারিত সময়ে সেদিন আনিস ভাইয়ের কাছে গেলে, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করলেন। বললেন, "আমি গিয়েছিলাম তোমাদের বন্ধুকে বোঝাতে। ও গোঁ ধরে আছে যে আনন্দবাজারের দেওয়া পুরস্কার

শ্রীপান্থ

নেবে না। কিন্তু অপারেশনের খরচটা তো তোমরা ভালোই বুঝতে পারছ। তপনদাও বললেন তরুণকে আর তোমাকে এ ব্যাপারে লাগাতে। তরুণকে পেলাম না। তোমাদের এটা করতেই হবে। যা করে হোক ওকে রাজি করাও। Don't worry my boy. He and I can very well bear with this disease."

তরুণ আর আমি এটা চেষ্টা করায় আমাদের উপর তাঁর অজস্র খিস্তি-খামার বর্ষিত হল। বোদাম বোদাম লাথি যে খাইনি, সেটা আমাদের পিতৃপুরুষের পুণ্যফল। তাঁর বক্তব্য, "দাঙ্গার ব্যাপারে আনন্দবাজারের ভূমিকার 'ফাউতাল' স্যারে হালায় জানে না নাকি? স্যারও আমার পোঙ্গায় বাঁশ দিবার চায়?" ইলিয়াসদা তাঁর স্যারকেও ছেড়ে কথা বলার লোক না। শেষ পর্যন্ত আমরা নিখিল সরকার মশাই (শ্রীপান্থ) বাদলবাবু ইত্যাদিদের সহায়তায় তাঁকে রাজি করাতে সমর্থ হয়েছিলাম।

পিয়ারলেস ইন-এ তাঁর (আনিস ভাইয়ের) সঙ্গে সর্বসমেত মোট ঘণ্টা দেড়েক আড্ডা হয়েছিল। খুবই আন্তরিকভাবে বলেছিলেন, এরপর থেকে ঢাকা এলে তাঁর বাসাই যেন আমার ঠিকানা হয়। ঢাকাতে বিভিন্ন বয়সি আত্মজন আমাকে নিয়ে

ওই সময়টাতে বড়ো বাড়াবাড়ি করে। সুতরাং প্রবীণদের হাতে আমাকে ছাড়তে চায় না। ফলে, আখেরে ক্ষতি হয় আমার। আমি স্বভাবগতভাবে আড্ডাবাজ মানুষ। কিন্তু সে-আড্ডা খুব কম ক্ষেত্রেই সারস্বত আড্ডা। সবই বারো-ভাজার গুলতানি। ফলে কমবয়সিদের সঙ্গেই সময়টা বেশি কাটে। আনিস ভাইয়ের মতো লোকের ব্যাপক কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ততা। বৃথা নষ্ট করার সময় তাঁদের বিশেষ থাকে না। কখনো-সখনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির আমন্ত্রণে পার্টি ইত্যাদি হলে, সেখানে ব্যাপক আড্ডা দেখেছি।

দুই

২০০৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ *বিষাদবৃক্ষ* বইটির জন্য আমাকে একটি মহার্ঘ সম্বর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিহাস বিভাগের প্রধান তখন মেসবাহ কামাল নামে এক ভদ্রলোক। এক রাতে তিনি ফোনে আমাকে জানালেন, “খবরটি আপনাকে জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আপনি শুনে শ্লাঘা বোধ করতে পারেন যে এই ঘটনাটির মূল উদ্যোক্তা আমাদের আনিস-স্যার, অর্থাৎ ডক্টর আনিসুজ্জমান। তবে যেহেতু তিনি এই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছেন, তিনি স্বয়ং অফিসিয়াল চিঠিতে সই করতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাংলা বিভাগের তরফ থেকে সম্বর্ধনাটা দেওয়া হোক। কিন্তু শ্রদ্ধেয়া পারভীন আপা আমাদের ইতিহাস বিভাগ থেকে

বাদল বসু

আগেভাগে ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিয়েছেন। আনিস-স্যার বলেছেন, বইটা আমি পড়েছি। বিষয়টাতে নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রাধান্য আছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের পাড়া থেকে অধিক দূরে বাস করে না। সবচেয়ে প্রধান কথা এই যে সম্বর্ধনাটা সার্বিক ভাবে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে। পারভীন হাসান এবং আমি বরং দুজনেই মিহিরকে ব্যক্তিগত-ভাবে চিঠি দেব।”

সর্বশেষ মেসবাহ কামাল জানালেন অফিসিয়াল প্রয়োজনীয় আয়োজন তিনিই করবেন।

পারভীন হাসান বা পারভীন আপা শের-এ বাংলা ফজলুল হকের মেয়ের ঘরের নাতনি। ইতিহাসের অধ্যাপিকা ছিলেন, তখন অবসরপ্রাপ্তা। তিনিই নাকি এই প্রসঙ্গটি কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করেছিলেন।

পারভীন হাসান

অনুষ্ঠানের বিষয়ে আর দু-একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। কারণ আনিস ভাইয়ের প্রসঙ্গ কথায় আত্মপ্রসঙ্গ বেশি বিস্তৃতি পাচ্ছে। পাঠক এই ব্যাপারটাকে অকারণ আত্মম্ভরিতা ভাবতে পারেন, যেটা আনিস ভাইয়ের ইহজাগতিকতার দর্শনে সাতিশয়ভাবে পরিত্যাজ্য বলে আমার ধারণা। আমার প্রতি সম্পাদকের অনুজ্ঞা ছিল আনিস ভাইয়ের অগস্ট ২০১২-তে প্রকাশিত সংকলনে ‘ইহজাগতিকতা’ নামক প্রবন্ধটি অবলম্বন করে তাঁরই বিষয়ে একটি আলেখ্য প্রস্তুত করা। বলা বাহুল্য,

কাজটি আমার ক্ষমতার বাইরে। বিকল্প হিসেবে আমি যথাসম্ভব অল্পকথায় আনিস ভাইয়ের কিছু আচরণগত কথা-গল্প উল্লেখ করে তাঁর স্বভাবটি উন্মোচন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

অনুষ্ঠান তখনও আরম্ভ হয়নি। দর্শকাসনের সামনের সারিতে আনিস ভাই এবং আমি পাশাপাশি বসে গল্প করছিলাম। এমন সময়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, স্বনামখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক তথা বামপন্থী ব্যক্তিত্ব জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এসে প্রবেশ করলেন। আনিস ভাই তাঁর জুনিয়র। সুতরাং তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। হিন্দু-বাঙালি রীতি অনুযায়ী দুজনেরই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

মেসবাহ কামাল

আনিস ভাই মেসবাহ কামালকে কাছে ডেকে বললেন, “কামাল, ঘোষণা করে দাও স্যার সভাপতিত্ব করবেন। আমি স্যারের উপস্থিতিতে সভাপতির আসনে বসলে সেটা বেয়াদপি হবে। আমি বরং আলাদাভাবে কিছু বক্তব্য পেশ করব যদি সময় পাওয়া যায়।”

এর ক-দিন আগে আমাকে কামালভাই (মেসবাহ কামাল) বলেছিলেন, “আপনি যদি আপনার বক্তব্য একটা পুস্তিকার আকারে তৈরি করে দেন ভালো হয়। পরশু অনুষ্ঠান। আপনি কালকে সকালের মধ্যে লেখাটা তৈরি করে দেন। মনে রাখবেন, আদেশটা আনিস-স্যারের। পরশুর মধ্যে লেখাটা পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিলি করা যাবে।”

আমি *দেশবোধের মানচিত্র* নামে লেখাটা তৈরি করে-ছিলাম। আনিস ভাইকে পড়িয়ে কামাল লেখাটা ছাপিয়ে ছিলেন। আনিস ভাই তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই লেখাটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে আমাকে অহংকারী করেছিলেন। লেখাটিতে কিছু পালি এবং সংস্কৃত শ্লোক (বুদ্ধ-বাণী) থাকায়, জনা তিনেক শ্রোতা বলেছিলেন, "ওসব আবার কেন?"

শেখ মুজিবুর রহমান

আনিস ভাই কাছেই ছিলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কি আরবি আয়াত থাকলে আপনারা খুশি হতেন বা বুঝতে পারতেন? বক্তা কিন্তু শ্লোকের তরজমাটাও দিয়ে দিয়েছেন।" ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং আনিস ভাই রাজনৈতিক দিক থেকে সমমেরুর লোক ছিলেন না। আনিস ভাই মুজিবুর রহমান এবং তাজউদ্দীন আহমদের মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন (এখনও আছেন) অতিমাত্রায় বামপন্থী পথের অনুসারী। কিন্তু আনিস ভাইয়ের সঙ্গে মতান্তর সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মনান্তর আমি অন্তত কখনো দেখিনি। আমি তাঁদের সংস্পর্শে যতটুকু এসেছি পরস্পরকে পরমত সহিষ্ণুই দেখেছি এবং তা নিজেদের মতের পথের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেই।

অনুষ্ঠানের পরে পরপর দু-দিন দু-টি সান্ধ্য ভোজসভায় আমন্ত্রণে আপ্যায়িত হয়েছিলাম, একটি মেসবাহ কামালের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে, অপরটি পারভীন আপার বাড়িতে। দু-টি ভোজসভাই অলংকৃত ছিল, ঢাকার সব সেরা পণ্ডিতগণের

দ্বারা। আনিস ভাই আমাকে নিয়ে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার অত্যন্ত সংকোচ হচ্ছিল। এইসব মানুষেরা, বিশেষ করে আনিস ভাই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত মানুষ। অপরপক্ষে আমার মধ্যে পাণ্ডিত্যের 'প' অক্ষরটি পর্যন্ত নেই।

এতসব বিখ্যাত বিদ্বজ্জন তথা অধ্যয়ন-অধ্যাপনাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিজেকে মনে হচ্ছিল নিতান্ত 'অনপড়' নেংটি ইঁদুর। আমি নিজের দীনতায় মরমে মরে যাচ্ছিলাম। আমার সুকৃতি এই যে, প্রকৃতিগতভাবে আমার মধ্যে কালিদাসীয় ভাষায় বললে বলতে হয়, একটা 'অশিক্ষিত পটুত্ব' আছে। কিছুমাত্র সারস্বত পুঁজি ব্যতিরেকেই আমি এমন সব মহান পণ্ডিত মানুষদের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারতাম যে সমমনস্ক বন্ধু-বান্ধবদের পর্যন্ত মনে হত যে আমি একটা বিরাট পড়াশোনা করা লোক। এটাই আজীবন আমাকে লজ্জা দিয়ে চলেছে।

তাজউদ্দীন আহমদ

কামাল এবং পারভীন আপার বাড়িতে সেই দুই ব্যাপক ভোজসভায় আনিস ভাইয়ের উদ্যোগে একসঙ্গে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে কারো সঙ্গেই সাধ মিটিয়ে আলাপ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। বেশিক্ষণই কথা বলতে হয়েছে আনিস ভাইয়ের সঙ্গে, আলাদা বসে। একসময় অবশ্য সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রায় জোর করে তাঁর সঙ্গে আলাদাভাবে বসতে বাধ্য করলেন। কামালের বাড়ির ভোজেও

আড্ডা-আলোচনা অনুরূপই হয়েছিল। অনুষ্ঠানের দিন, আনিস ভাই কামালকে বলেছিলেন, “কামাল, মিহিরকে একটা বাংলা ও ইতিহাসে যৌথ ছাত্রদের ক্লাসে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কিছু বক্তব্য বলাও।”

বললাম, “আনিস ভাই, আমি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠও ডিঙোইনি। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?”

অভিজিৎ সেন

কামাল বললেন, “আমরা আপনার *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম* এবং *বিষাদবৃক্ষ* সাবল্টার্ন হিস্ট্রির পাঠ্য হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওই বই দু-টির বিষয়ে আপনি কিছু সাধারণ বক্তব্য ওদের বললেই হবে।”

আনিস ভাই বলেছিলেন, “এর চাইতে ভালো আর কিছু হয় না, তবে সেটাই হোক।”

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এর পরের সাক্ষাৎ ঘটেছিল ২০১২-র ৩১ অগস্ট, যেদিন ‘কারিগর’ তাঁর *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য* নামক প্রবন্ধ সংকলটি প্রকাশ করে সেদিন। কারিগর অনুষ্ঠানটিতে অভিজিৎ এবং আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল। আনিস ভাই কলকাতায় এসে ব্যক্তিগতভাবে মোবাইলে জানালেন, “এলে দেখা হবে এবং ভালো লাগবে। অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই।” আমরা দুই ভাই-ই গিয়েছিলাম এবং দীর্ঘ সময় গল্প আড্ডায় খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। অভিজিতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। সেবারেই আলাপ হয়। আনিস ভাই,

গল্প এবং উপন্যাসকার হিসেবে অভিজিতের লেখার গুণগ্রাহী ছিলেন। আলাপ ছিল না।

কারিগর প্রকাশিত বইখানির প্রথম দিনের গ্রাহকদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আনিস ভাই ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন, "ঢাকা এলে, আমার বাসায় অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অফিসঘরে দুজনকে আড্ডা-আলোচনার আমন্ত্রণ রইল। ইতিমধ্যে নিশ্চয় বইটা পড়ে বলতে পারবেন। ইহজাগতিকতা সম্পর্কে আপনার কিছু প্রশ্ন আছে বলে আপনার কথায় আমার মনে হয়েছে। তা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। বিষয়টি আমার প্রিয়।"

দেবজ্যোতি দত্ত

ওই বছরেই একটা সময়ে তাঁর বাংলা বিভাগে গিয়েছিলাম। তখন অবশ্য ভিন্ন উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম এবং তখন আমার মাথায় ইহজাগতিকতা বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের তত্ত্বালোচনার কথা মনে ছিল না। কিন্তু অনেকক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার পর আনিস ভাই ঠিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, "*ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য* পড়লেন? কী একটা জিজ্ঞাসার কথা বলতে চাইছিলেন যেন?"

বললাম, "আজ আপনাকে অনেক বসিয়েছি। বেলা শেষ। আমাকে রামপুরাতে যেতে হবে। আজ থাক, ভবিষ্যতে হবে। তাছাড়া আমার কথাটা এমন কিছু আলোচনার যোগ্যও নয়।"

বললেন, "তবু মূল প্রশ্নটা শুনিই না। আমাকেও শুনে চিন্তা করতে হবে।"

তাঁর এই অতিভদ্র বাক্যে আমি প্রকৃতই লজ্জা পেলাম। কোথায় তিনি আর কোথায় আমি। আমি তখন পালিয়ে বাঁচার পথ খুঁজছি। তথাপি কথাটা তিনি জেনে ছাড়লেন। বললেন, "মূল কথাটা শুনিই না। প্রবন্ধটায় আমি যে শেষ কথা বলেছি, তা তো নয়।"

আমি একেবারেই আহাম্মকের মতো বললাম, "আপনি হয়তো আমাকে স্টুপিড ভাববেন, কিন্তু সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনে, মনে হয়েছিল, ব্যক্তিমানুষের জীবনে যদি ইহজাগতিকতার আধিক্য ঘটে, তাহলে অতি ভোগবাদ কি সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে না? তবে রচনাটি পড়ে পরে আমার বোধ যথেষ্টই পরিষ্কার হয়েছে। আচ্ছা আপনি কি ইংরেজি 'Secular' শব্দটির বাংলা হিসেবে 'ইহজাগতিকতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণত অনেকেই সেকুলার শব্দটির অর্থ ধর্মনিরপেক্ষ বলে থাকেন। তপনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—উনি বললেন, 'এটা একেবারেই ভুল শব্দ। শব্দটি বহু অর্থবোধক। আমরা সাধারণত বর্তমান জগতের বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক কিছু বোঝাতে সেকুলার কথাটি ব্যবহার করি। ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ রিলিজিয়ন। ঠিক একটি বিশেষ শব্দে তার বাংলা পাইনি।' আমি তখন আপনার ব্যবহৃত 'ইহজাগতিকতা' শব্দটি বললাম, তপনদা বললেন, 'মনে হচ্ছে আনিস ঠিকই বলেছেন। তবে লেখাটা পড়তে পারলে ভালো হত। তুমি তো রবিদার (রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত) কাছে যাও, তাঁকে

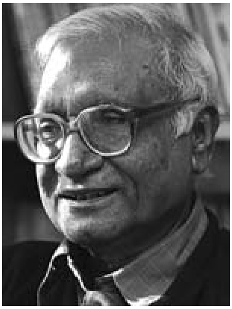

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

জিজ্ঞেস করে দেখো।’ রবিদা সপক্ষে ভোট দিয়ে বললেন, “আনিসকে চেনো নাকি? ও তো খুব ভালো ছেলে। আমি ওকে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রবন্ধকার এবং প্রকৃত ভালো মানুষ হিসেবে গণ্য করি’।”

রবিদার স্বভাবই ছিল কাউকে প্রশংসা করতে হলে তর-তম প্রত্যয়ের ‘তম’ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা। আনিস ভাইও তাই বললেন। কিন্তু আনিস ভাইয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিতে কোনো আতিশয্য রবিদার ছিল না, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

যে মানসিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় আনিস ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে বসেছি, তা-তে লেখা বড়োই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এমনকি পাঠকের এরকমও মনে হতে পারে যে আমি নিজের গৌরব বা বাহাদুরি জাহির করার জন্য এই লেখাটা লিখছি। কিন্তু আমার সুকৃতি এইটুকু যে কিছু-কিছু কার্যকারণবশত আমি আনিস ভাইয়ের অহৈতুকী স্নেহভাজন হতে পেরেছিলাম। আমার মতন স্নেহভাজন তাঁর শয়ে-হাজারে ছিল এবং তাঁদের অনেকেই এখনো আছেন। শিশু সাহিত্য সংসদ তথা সাহিত্য সংসদের কর্ণধার দেবজ্যোতি দত্ত, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দেবজ্যোতি সপরিবারে আনিস ভাইয়ের অত্যন্ত নিকটজন এবং আমার সঙ্গে দেবজ্যোতির বন্ধুত্বের খাতিরে আমিও তার অংশীদার।

আমার দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়, আবদুল হকের সান্নিধ্যের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি সাক্ষাৎভাবে তাঁর পরিচিত হতে পারিনি। পরে কথাটা আনিস ভাইকে বলায়, তিনি বলেছিলেন, "আপনার *শরণার্থীর মুক্তিযুদ্ধ* বইটা সেক্ষেত্রে অধিক তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারত। অবশ্য সে-সময় এসব নিয়ে কথা বলার সময় দিতে পারতাম না। বইটা নতুন করে লিখুন।" বইটা ঢাকা থেকে বেরিয়েছিল। আমার এক বন্ধু আনিস ভাইকে বইটা পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু আনিস ভাইয়ের ইচ্ছে মতন বইটা আর পুনর্লিখন সম্ভব হয়নি।

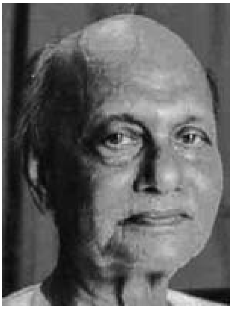

আবদুল হক

তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রধান ছিল অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। সেসব ব্যতিরেকেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে অক্লান্তভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন। এসব কথা অবশ্য তাঁর পরিচিত সবারই জানা। আমার বিচারে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক এবং সুবক্তা।

অনেকবার, অনেক অনুষ্ঠানে তাঁর অনুজ্ঞায় আমি যোগ দিয়েছি। একজন পঠন-পাঠনে খর্বকায় এক ব্যক্তির পক্ষে এটা যে কতখানি শ্লাঘার তা বলার ভাষা আমার আয়ত্তে নেই। আনিস ভাইয়ের সই-করা একখানা আমন্ত্রণপত্রের অনুজ্ঞা পালন করা ডাক্তারের নিষেধের কারণে আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তখন আমার বুকে দু-টি 'স্টেন্ট' বসানো হয়েছিল। ছ-মাসের আগে দেশের বাইরে যেতে দিতে রাজি হননি ডাক্তার। কাছাকাছি

অতীতের অনেক কিছুই এখন আর মনে রাখতে পারি না। সম্ভবত অনুষ্ঠানটা ছিল বিশ্বের তাবৎ দেশের বাংলাভাষায় যাঁরা লেখালেখি করেন, সেইসব লেখকদের একটি বৃহৎ সম্মেলন। কর্তৃত্বে ঢাকা বাংলা একাডেমি। আনিস ভাই সম্ভবত তখন বাংলা একাডেমির সভাপতি। আমি ২০১৫-এর শেষে বাংলাদেশে যাই। সেবার ঢাকা যাইনি। তারপর আর ওদেশে যাওয়া হয়নি এবং আনিস ভাইয়ের সঙ্গেও সামনাসামনি সাক্ষাৎ ঘটেনি। আন্তর্জাতিক বাঙালি লেখকদের সম্মেলনটা বোধহয় হয়েছিল ২০১৭-এর শেষে অথবা ২০১৮-এর শুরুতে। বার দুয়েক মাত্র ফোনালাপ হয়েছে। তখন তাঁরও শরীর ভালো ছিল না। এরপর থেকে তাঁর খবরাখবর দেবজ্যোতির মারফতেই পেতাম।

নিরন্তর গবেষক এই মানুষটির খুব কম রচনাই পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান উল্লেখ্য *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*। *পুরোনো বাংলাগদ্য*, *মুক্তিযুদ্ধ* এবং তারপরের বইটি আমার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাগ্যদোষে পড়া সম্ভব হয়নি। অথচ বইটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম। কেউ একজন (বন্ধুই হবেন) বলে বা না-বলে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্ভবত। পরে আর মনে করতে পারিনি, বোধহয় তিনিও না। সব চাইতে দুঃখ রয়ে গেল তাঁর *বিপুলা পৃথিবী* নামক সর্বশেষ বইখানা এখনো চোখেই দেখিনি। কারণ বইটির প্রকাশ ২০১৭-তে যখন থেকে আমি নিজেও অসুস্থ এবং অচল।

শিবনারায়ণ রায়

আনিস ভাইয়ের অধিকাংশ বই-ই গবেষণামূলক প্রবন্ধধর্মী। কিন্তু আমি এমন মাপের পড়ুয়া নই যে তাঁর মাপের একজন গবেষকের লেখা পড়ে হজম করব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কে কীরকম লেখেন, কার কী ত্রুটি-বিচ্যুতি, সেসব নিয়ে তাঁকে কখনো অযথা সমালোচনা করতে শুনিনি। অবশ্য তাঁকে কতটুকুই-বা আমি পেয়েছি। নিজের কাজকর্ম নিয়ে তাঁর কোনো বার-ফাট্টাই আলোচনা কোনো আড্ডায় শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তবে কারোর লেখার মধ্যে যদি সামান্যতম সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও থাকত, সেখানে তিনি নির্মম হয়ে উঠতেন। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন এবং কঠিন আক্রমণ করতেন। কিন্তু সেসব তাঁর লেখায় বিশেষ প্রকাশ হত না। বলতেন, অসাম্প্রদায়িকতা আমি আমার এবং আমার সমমনস্কদের স্বভাবে ও আচরণে অভ্যাস করতে চাই। আমার বিশ্বাস লেখালেখিতে সেসবের ক্রুদ্ধ বাদ-প্রতিবাদে কোনো লাভ হয় না। শুধু তিক্ততারই চর্চা হয়।

আমার রচনার বড়ো মাপের বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনের মুখে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি, তাঁরা হলেন বয়সের ক্রমানুসারে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, তপন রায়চৌধুরী এবং শিবনারায়ণ রায়। আনিস ভাইও প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের কথা উঠলে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে উঠতেন। শিবুদা আমার *উজানী খালের সোঁতা* নামক আনন্দ প্রকাশিত পাঁচটি লেখার একটি সংকলন বইয়ের রিভিউ প্রবন্ধ ‘বইয়ের দেশ’-এ লিখেছিলেন। লেখাটির নামকরণ করেছিলেন, ‘আঠারো আনা খাঁটি ভাটিপুত্র’। আনিস ভাই লেখাটি পড়েছিলেন। একবার কলকাতায় এসে

দেবজ্যোতির অফিস থেকে ফোনে আমাকে বলেছিলেন, "আপনি শ্লাঘা বোধ করতে পারেন, তিন-তিনজন মহারথীর মনোযোগ আপনি আকর্ষণ করতে পেরেছেন।"

আমি অবশ্য একারণে আমার পুচ্ছটি স্ফীত করে উচ্চে তুলেছিলাম। কিন্তু যে-লোকটি সারা জীবন অসংখ্য প্রশংসা, পুরস্কার এবং সম্মান পেয়েছিলেন, তাঁর নিজের বিষয়ে কোনোদিন একটা বাক্যও শুনিনি। এসব নিয়ে কোনো আলোচনা উঠলে অন্য কথা উত্থাপন করে থামিয়ে দিতেন।

আমার এই লেখাটির জন্য বন্ধুবর দেবজ্যোতি দত্ত প্রথমে আমাকে বলেছিল। বলেছিল, "আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা নিয়ে আনিসদার একটি স্মৃতিচারণ করো।" 'হরপ্পা' সাময়িক পত্রিকাটির সম্পাদক সৈকত মুখার্জি বললেন, "লেখাটা তাঁর ইহজাগতিকতা বিষয়ক ধ্যানধারণা এবং বক্তব্য বিষয়ে হলে আমি খুশি হব। আপনি লিখতে বসে যান।" সৈকত এখনো আমার ক্ষমতার দৌড় বা পরিমাপটা জানেন না। এ জাতীয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আমার না-আছে স্বাভাবিক নিজস্ব ধারণা, না পড়াশোনা। তাই, এই আলেখ্যে আমি আমার ছেঁড়া-খোঁড়া স্মৃতির একটা বিশৃঙ্খল বিবরণের অনাবশ্যক আত্মশ্লাঘাকারী মূর্খতার অক্ষর-ডম্বরের ধ্বনিতে উপস্থিত করলাম।

'ইহজাগতিকতা' প্রবন্ধটিতে আনিস ভাই তাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে,

> যে-জগৎ ইন্দ্রিয়গোচর ও যুক্তিগ্রাহ্য এবং যে-জীবন জন্ম ও মৃত্যুর সীমায় আবদ্ধ, সেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উৎকণ্ঠাকেই বলা যায় ইহজাগতিকতা। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এ এক

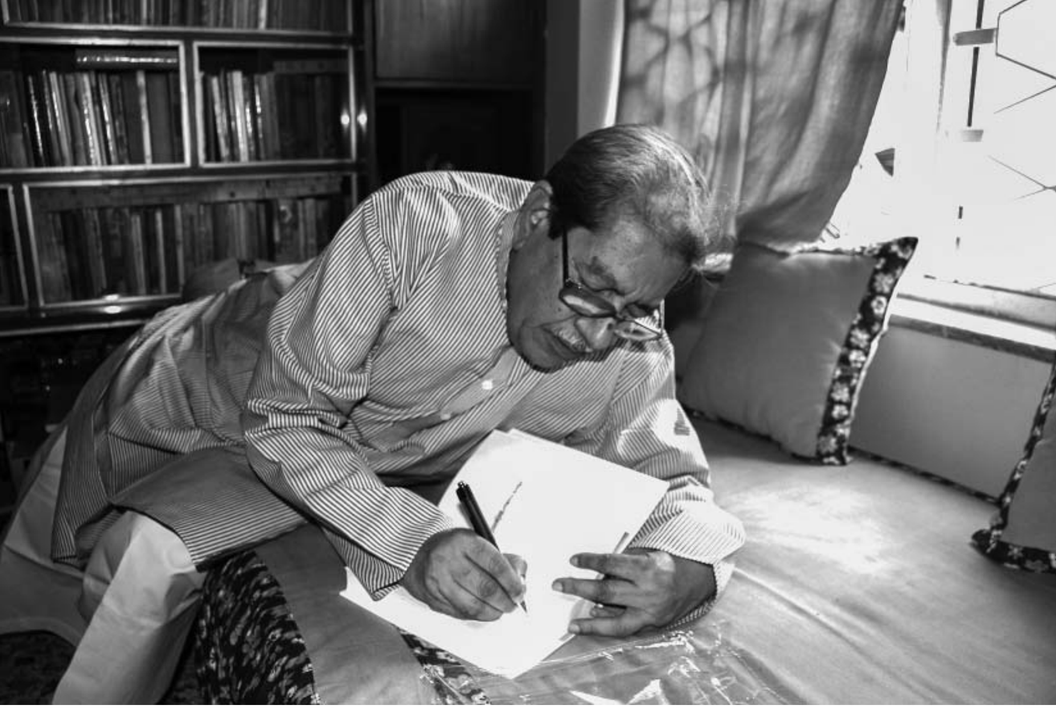

'ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য' বইতে সই করছেন লেখক আনিসুজ্জামান

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

> সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরলোক ও পরকাল সম্পর্কে কিংবা অতিপ্রাকৃত ও আত্মা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রশ্রয় পায় না। পৃথিবী ক্ষুদ্র হোক আর বিপুলা হোক, জীবন পদ্ম পত্রে নীর হোক আর জীবকোষের সমাহার হোক, এই পৃথিবীতে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পরিপূর্ণ মানবজীবনের সাধনাই ইহজাগতিকতার মূল কথা।

আনিস ভাইয়ের সংজ্ঞায়ন সর্বতোভাবেই যুক্তিপূর্ণ। আমার ক্ষুদ্র কাণ্ডজ্ঞানে, ইচ্ছে থাকলেও তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে বিতর্ক তুলতে সাহস পাইনি। তবে আমার ধারণা, এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবসম্মত মননে যতই সামগ্রিকতার দাবি করুক, আদিকাল

থেকে ধর্ম, অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত ও আত্মা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা অধিকাংশ মানব সমাজকে এক অতি জটিল উর্ণজালে যেভাবে জড়িয়ে রেখেছে, ইহজাগতিকতার দর্শন তাকে সহজে দূরীভূত করতে পারবে বলে স্বতই মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। কিছু সংখ্যক চিন্তক তাঁদের শুভ চিন্তায় এই প্রচলিত জটিলতা থেকে মানুষকে ইহজাগতিকতার সমাজবীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত জীবনে উত্তীর্ণ করতে পারবেন কিনা বা পারলেও তা কত শত যুগের অক্লান্ত সাধনায় সম্ভব হবে সে অনুমান করা দুরূহ।

আনিস ভাইদের মতো তীর্থংকরেরা ধন্য। তাঁরা একথা জেনেই সেই অনন্তকালের নিরবচ্ছিন্ন প্রব্রাজনার তপস্যায় নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছেন।

পাঠক, আমার অনধিকার চর্চা মার্জনা করবেন। এই অসমাপ্ত প্রব্রজ্যার কাহিনির উপস্থাপনার জন্য।

আলোকচিত্র: শেষটি ছাড়া সবগুলি আন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত

লেখক বিশিষ্ট কথাশিল্পী।

মাঝে মাঝেই প্রকাশ পেতো। আমরা য[illegible] মনে করিয়ে দিতাম যে, দুলাভাইরা স[illegible] বা[illegible], তিনি আপত্তি করে বলতেন, ওরা [illegible]গা সবাই প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের। যদি [illegible]লা হতো, [illegible]লাভাই তো ফরিদপুরের লোক—খাস বাঙাল, [illegible]লতেন, বড়োদুলা[illegible] আলাদা। বস্তুত বড়ো[illegible]ভাইয়ের প্রতি তাঁর [illegible] ভালোবাসা ও নির্ভরতা[illegible]ক জ্ঞান করতে[illegible] জ্যে[illegible]পুত্র হিসেবে—[illegible]কে সেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। জীবনের [illegible]র্যন্ত পরামর্শের জন্যে বড়োদুলাভাইকেই আগে ডেকেছেন, আর তা নিয়ে আমাদে[illegible]বিবারে কেউ কখনো মন খারাপ করেনি। বড়োদুলাভাইও সে-সময়ে চিঠি লিখে জা[illegible]ন, ঢাকায় চলে যাওয়াই শ্রেয়।

আব্বা একবার গেলেন এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে কথা বলতে। বছরখানেক আগে তিনি ফিরে এসেছেন মুসলিম লীগে (সেদিন তাঁর বাড়ির সামনে যে-আনন্দোৎসব দেখেছিলাম, তা মনে রাখার মতো; তবে তার কিছুকাল আগে মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে গালমন্দ করে পচা ডিম আর ঢিল ছুঁড়েছিল তাঁর বাড়িতে, সে কথাও মনে পড়ছিল)—কিন্তু ঠিক কলকে পাচ্ছেন না। ফজলুল হকের কাছ থেকে আব্বা ফিরে এসেছিলেন এই ধারণা নিয়ে যে, তিনি প[illegible]স্তানে যাবেন বটে, তবে কবে যাবেন, তা স্থির করেন নি। ওদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী [illegible] গান্ধির সার্বক্ষণিক সহচর। ১৫ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা-দিবস থেকে গান্ধি কলকা[illegible]য় আছেন—সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষা করার লক্ষ্যে। সোহ্‌রাওয়ার্দী যোগ দিয়েছেন [illegible]র [illegible]ঙ্গ। এ নিয়েও প্রতিক্রিয়া মিশ্র। কেউ বলেছেন, ক্ষমতাসীন হ[illegible]ত না পেরে [illegible] সোহ্‌রাওয়ার্দী এখন গান্ধির কৃপাভিখারি। অন্যেরা বলছেন, কল[illegible]র—[illegible]ধু ক[illegible]তার [illegible] [illegible]মবঙ্গের—মুসলমানদের বাঁচানো, তাঁদের স্বার্থরক্ষাই [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] তিনি কিছুই চাইছেন না। একবার শোনা গেল, সোহ্‌রাওয়ার্দী[illegible] হি[illegible] তরু[illegible]র কয়েকজন আঘাত করার চেষ্টা করেছে—অবশ্য তেমন কিছু হয় নি। [illegible] জানা গেলো, বেলেঘাটায় গান্ধি যেখানে থাকছিলেন, সেখানে [illegible] মহাসভার যুবকে[illegible]রা আক্রমণ চালিয়ে[illegible]—তাদের লক্ষ্য ছিল গান্ধিকে হত্যা [illegible] সে-আ[illegible] বি[illegible]ফ[illegible]য়েছে।

প্রায় এর স[illegible] কাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা [illegible]। তিন-চারদিন একটানা চললো দাঙ্গা, তা রোধ ক[illegible] গেল [illegible]। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত গান্ধি অনশ[illegible] করলেন; সোহ্‌রাওয়ার্দী ছুটে [illegible] দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকায়; সর[illegible]রের ভে[illegible] ও [illegible]তাদের [illegible] কেউ [illegible]লেন ন[illegible] এক জায়[illegible] গিয়ে এবং আরে[illegible]গায় কয়েকজন [illegible] রক্ষা করতে [illegible]য়ে প্রাণ দিলেন দুই হি[illegible]।

[illegible] থামতে না থামতে আ[illegible] হলাম। অচিরেই [illegible] ম্যালেরি[illegible]রছে—যশোরের বনে[illegible]রয়া। জ্বর বেশি হলে [illegible] মধ্যে [illegible] দেখতাম, ব্রাইট স্ট্রিট দিয়ে [illegible] আসছে আমাদের মারতে। [illegible] চিৎকার করে উঠতাম, 'শিখ আ[illegible]ছে, [illegible]সছে।' ঘোর কাটাবার চেষ্টায় আমার শরীর ঝাঁকিয়ে মা বলে, 'না, শিখরা আ[illegible]না; কোনো গোলযোগ হচ্ছে না; আমরা নিরাপদে আছি।' আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তার[illegible]র আবার এক সময়ে চিৎকার করি, 'শিখ আসছে, শিখ আসছে।'

আনিসুজ্জামানের গবেষণা ও জীবনাদর্শ

আনিসুজ্জামান সাহিত্যের অধ্যাপক ও গবেষক। কিন্তু এর বাইরেও তাঁর চিন্তা ও কর্ম প্রসারিত। গবেষকের অধ্যয়নের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি এদেশের সমাজ রাজনীতি সম্পর্কেও ছিলেন উৎসাহী; অনেকটা সক্রিয় ভূমিকাও পালন করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। সেই বয়সেই তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সেই সময়ে যুবলীগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প্রথম পুস্তিকাটিও রচনা করেছেন

তিনি। রবীন্দ্রচর্চায় পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করার কাজেও উদ্যোগী ছিলেন। শুধু প্রতিবাদ সংগঠনের কাজই নয়, তৎকালীন পূর্ববাংলার রবীন্দ্রচর্চাকারীদের লেখা নিয়ে ১৯৬৮-তে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন *রবীন্দ্রনাথ* নামে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটি সেই সময় পূর্ববঙ্গে তো বটেই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎসমাজেও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় চট্টগ্রামের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে দু-টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১-এর ১৫ ও ২৪ মার্চ। এই দু-টি সভা আয়োজনে আনিসুজ্জামান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৫ মার্চে লালদীঘি ময়দানের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল। সভায় কয়েকটি বাক্যের এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আনিসুজ্জামান বলেছিলেন: “আজ এদেশে যে সংগ্রাম ও আন্দোলন চলছে, তাতে জনগণ আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছেন। আমরা শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে এই আবেদন জানাতে চাই যে, আমরাও আপনাদের সাথে হাত ধরে চলতে চাই; আপনারা দয়া করে আমাদের সঙ্গে নিন।” সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আনিসুজ্জামানের এই বক্তৃতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে, সেই উত্তপ্ত আন্দোলনের সময় জনগণের ভূমিকাকেই তিনি মুখ্য করে দেখেছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের অবদানের মহিমাকীর্তন করেননি। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রবাসী সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য

হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলাভাষ্য রচনার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা তাঁরই। বাংলাদেশের সংবিধানের মুসাবিদা ইংরেজিতে করেছিলেন ড. কামাল হোসেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, সংবিধানের বাংলাভাষ্য রচনাতেই আনিসুজ্জামানের অবদান সীমিত নয়, তিনি ছিলেন সংবিধানের সহপ্রণেতা। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক আইনি ও সাংবিধানিক পরিভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে। ইংরেজি ও বাংলায় সংবিধানের দু-টি পাঠ থাকলেও এর বাংলাভাষ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫৩ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপধারায় বলা আছে :

> (২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।
>
> (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে :
>
> তবে শর্ত থাকে যে বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

এতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষ্যটিই প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজি ভাষ্যটিকে ‘নির্ভরযোগ্য

অনুমোদিত পাঠ' হিসেবেই অভিহিত করা হয়েছে। বাংলা ভাষ্য রচনার কৃতিত্ব যে প্রধানত আনিসুজ্জামানেরই—এটা সর্বজনবিদিত।

বাংলা ভাষায় সংবিধান প্রণয়নের গুরুত্ব শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় যে, এটি বাংলায় প্রণীত হয়েছে এবং বিশ্বে এটিই বাংলায় রচিত একমাত্র সংবিধান। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এককালীন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন :

> Our language was the cohesive force in our liberation movement. In a sense the Struggle for national independence started on 21 February1952. Framing the Constitution in Bengali for the first time in our history was a monentous event. It was a great leap forward towards internalising modern constitutional concepts in our legal culture.

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের উপরিউক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। বাংলায় সংবিধান প্রণয়নের ফলে আইনচর্চার সংস্কৃতিতে আধুনিক সংবিধানের ধারণা বাংলা ভাষায় একীভূত হল—এই অর্জনও কম নয়।

আইন ও সংবিধান সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের বিশেষ জ্ঞান ও পারদর্শিতার কারণেই মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান যখন আইন-শব্দকোষ সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করলেন আনিসুজ্জামানকে। তাঁদের

যৌথ সংকলন ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *আইন-শব্দকোষ*। এই শব্দকোষ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কথা বলেছেন সম্পাদকদ্বয় :

> বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষা প্রয়োগের বিষয়ে এই অনুচ্ছেদ আমাদের প্রতি অনপনেয় দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। বাংলাভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে যে-উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরবর্তীকালে তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নাই, তাহা নহে। বাংলায় সংবিধান-রচনা এক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। পরিকল্পনার দলিল হইতে শুরু করিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে বাংলার যথাযথ ব্যবহার ঘটিয়াছে। বাংলাভাষায় আইনচর্চার ক্ষেত্রেও কিছু অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। [....] বাংলাদেশে ১৯৮৭ সাল হইতে বাংলায় আইন প্রণীত হইতেছে।
>
> অপরদিকে নিম্ন আদালতে বাংলাভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটিলেও উচ্চ আদালতে এখনো বাংলাভাষা প্রচলিত হয় নাই। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ইংরাজি ভাষাতেই যুক্তিতর্ক উপস্থাপন, আইনের ব্যাখ্যাদান ও আদালতের রায় ঘোষণার কার্য অব্যাহত রহিয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি রায় বাংলায় প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মূলধারাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই, বরঞ্চ ব্যতিক্রম হিসাবেই বিরাজ করিতেছে। আদালতের ভাষারূপে বাংলার এই অবস্থার মূলে কাজ করিতেছে ভাষাব্যবহারে ব্যক্তির অনভিজ্ঞতা, সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ভাষানীতির অভাব এবং অনেক

> সময়ে আইনি পারিভাষিক শব্দাবলির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা।
>
> এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় একটি আইন-শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সকল মহলেই অনুভূত হয়।

লক্ষণীয়, এই ভূমিকাটি রচিত হয়েছে বাংলা সাধু গদ্যে। এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সম্পাদকদ্বয় :

> বাংলাদেশের সংবিধান এবং সংবিধিবদ্ধ আইনে সাধু ভাষারীতি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্তমান শব্দকোষেও সাধুরীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

দেশের সংবিধান ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হলে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—এই উপলব্ধিও তাঁদের বিবেচনায় ছিল :

> দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হইলে দেশের প্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে না এবং আইনের শাসনের আলোকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই বিশ্বাস ও উপলব্ধি আমাদেরকে এই শব্দকোষের কাজে উৎসাহিত করিয়াছে।

প্রায় ছয়হাজার ভুক্তি সম্বলিত এই অভিধানই সম্ভবত বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ আইন-অভিধান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে পনেরো খণ্ডের যে মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংকলিত হয়, তার সম্পাদনা ও প্রামাণিকতা পর্ষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আনিসুজ্জামান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

স্ত্রী সিদ্দিকা জামানের সঙ্গে

সম্পর্কিত সংগৃহীত দলিলগুলোর প্রামাণিকতা বিচার করে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের আকর সংগ্রহের কাজ সহজসাধ্য ছিল না। এই কাজে আনিসুজ্জামান তাঁর অভিনিবেশ, বিচারবোধ ও বস্তুনিষ্ঠতার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংগ্রহ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই বলেছেন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান থাকাতে এই কাজ অনেকটাই সহজ ও নির্ভুল হয়েছে।

১৯৫২ থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি গণ-তান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আনিসুজ্জামান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, তাঁর সহযোদ্ধাদের মতোই তিনিও আশা করেছিলেন বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু অচিরেই তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিল, তাদের অপতৎপরতা বন্ধ হয়নি। কখনো গোপনে, অবস্থা বুঝে কখনো প্রকাশ্যে তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। একাত্তর সালে যারা যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত ছিল, তারা আবার সক্রিয় হয়ে বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এই অবস্থায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠল দেশব্যাপী। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে শুরু হল গণ আন্দোলন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে গঠিত হল 'গণ আদালত'। এই গণ আদালতে প্রতীকী বিচার করা হল একাত্তরের ঘাতক ও পাকিস্তানের দোসরদের। আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে সাব্যস্ত হল, এই ঘাতকদের যুদ্ধাপরাধী না-বলে, মানবতাবিরোধী বলে অভিহিত করাই

যুক্তিযুক্ত হবে। আনিসুজ্জামানই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এই মানবতাবিরোধীদের বিচারের জন্য গঠিত গণ আদালতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা পাঠ করলেন আনিসুজ্জামান। এই জন্য তাঁর এবং আরও তেইশজন বরেণ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল, তাঁদের বিরুদ্ধে আনা হল দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। এই অভিযোগ নিয়ে তাঁদের কাটাতে হয়েছে অনেকদিন। পরে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হলেন, তখন তিনি দেশদ্রোহিতার অভিযোগে রুজু করা মামলাটি সরকারের তরফ থেকে প্রত্যাহার করার আদেশ দেন।

আনিসুজ্জামান সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও তাঁর অধ্যয়ন ও চিন্তার পরিধি ব্যাপক। তাঁর সাহিত্য-গবেষণাও ইতিহাস-চিন্তা ও সমাজভাবনায় সমৃদ্ধ। তাঁর প্রথম গবেষণা ছিল 'ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)'। এই গবেষণা-কর্মটি পরে *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অবদানে সমৃদ্ধ। এর তুলনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের পশ্চাৎপদতা বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করেছেন যে ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে—বাঙালী মুসলমান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অথচ তাঁদের সাহিত্যানুরাগ

> বা সৃষ্টিক্ষমতা যে লোপ পায় নি, তার প্রমাণ আরবী-ফারসী শব্দবহুল কাব্যধারার মধ্যে পাওয়া যায়।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপরিহার্য মনে করেছেন। তাঁর মতে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, বাংলার সমৃদ্ধ আধুনিক সাহিত্য তারই ফল। এই জাগরণ দেখা দিয়েছিল বাংলার হিন্দুসমাজে। আলোচ্য সময়ে বাঙালি মুসলমানের প্রবণতা ছিল প্রাচীন ধর্মজীবনের আদর্শে প্রত্যাবর্তন। ফলে আধুনিক জীবনাদর্শের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। বর্তমান সম্পর্কে এই সম্প্রদায়ের আগ্রহ দেখা দেয় ১৮৭০-এর দিকে; সেই সময় আধুনিক শিক্ষার প্রতিও তাঁরা মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই আধুনিক সাহিত্যে তাঁদের মনোনিবেশ ঘটে। আনিসুজ্জামান মনে করেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে আমাদের সাহিত্য বিচার বিচলিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-কর্মের মূল্যায়নের ব্যাপারে এই অসম্পূর্ণতা বা অভাবকেই তিনি দূর করতে চেয়েছেন।

বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চায় আধুনিক জীবনবোধের অনুপস্থিতির কারণগুলো তিনি শনাক্ত করেছেন। এই সময়ে গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের ভাঙন, জীবনযাত্রার শহরমুখিনতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জমির পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন ও প্রাধান্য—এই সব কারণে সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তনের ফলে নতুন শ্রেণিবিন্যাস দেখা দেয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলেও মুসলমান সমাজ সংগঠিত হতে পারেনি। তাঁদের হাতে

নগদ অর্থের সঞ্চয় ছিল না। পরিবর্তিত অবস্থায়ও হিন্দু সম্প্রদায়ই নিজেদের সুসংহত ও সমৃদ্ধ করে তোলেন। মুসলমানগণ তাঁদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখেন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে।

সামাজিক পশ্চাৎপদতার প্রভাব লক্ষ করা গেছে মুসলমানদের সাহিত্য রচনায়ও। ১৮৬০ সালে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক জীবনচেতনার সূত্রপাত হলেও ১৮৬৯ সালে রচিত মীর মশাররফ হোসেনের *রত্নাবতী*র বিষয়বস্তু ছিল মধ্যযুগীয়। অষ্টাদশ শতকের সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতার প্রভাব উনিশ শতকেও অব্যাহত ছিল, এর প্রভাব সাহিত্যে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন আনিসুজ্জামান :

> এর মধ্যে যে প্রধান লক্ষণগুলো আছে, যেমন, বাস্তব জীবন থেকে সরে থাকার প্রচেষ্টা, আদর্শবাদের অভাব, সমকালীন জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, নারী সৌন্দর্যের স্তুতি সত্বেও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা—এর সব কিছুই ক্ষয়িষ্ণু সমাজভুক্ত মানুষের মানসিকতার ফল।

এই ক্ষয়িষ্ণু কালের মুসলমান লেখকদের রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিচার করে আনিসুজ্জামান এগুলোকে 'মিশ্রভাষারীতি'র সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। প্রসঙ্গত এই ধরণের রচনার ভাষাকে অনেকে 'দোভাষী ভাষা' বা 'মুসলমানী বাংলা' বলেও চিহ্নিত করেছেন। আনিসুজ্জামান মনে করেন :

> ইদানিং এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে একে দোভাষী পুঁথি বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই ভাষায় তো দুটি ভাষা নয়, বহু ভাষার (বাংলা, হিন্দী, ফারসী, আরবী ও তুর্কী) শব্দ এসে মিলেছে। যেখানে বাঙালী মুসলমান পরিবারে কথোপকথনের

> ক্ষেত্রে শতকরা পনেরো ভাগের বেশী আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার হয় না, সেখানে গরীবুল্লাহ্‌র ‘আমীর হামজা’য় শতকরা বত্রিশ ভাগ বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং বিদেশী শব্দবাহুল্যের কথা বিবেচনা করে একে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলা অসঙ্গত নয় এবং তার অনুসরণে এই কাব্যধারাকেও মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

এখনও দোভাষীরীতির কাব্য নামে উপরিউক্ত রচনাগুলো অভিহিত হলেও, এবং এই অভিধা বহুল ব্যবহৃত হলেও, যুক্তির বিচারে আনিসুজ্জামানের সিদ্ধান্তটিই সঙ্গত— এতে সন্দেহ নেই।

বাঙালি মুসলমানের অনাধুনিকতার পেছনে কোনো সজ্ঞান আদর্শানুসরণের যোগ ছিল বলে তিনি মনে করেন না। তরিকা-ই-মুহম্মদী বা ফারায়েজি আন্দোলনের প্রভাবও মুসলমান লেখকদের মধ্যে দেখা যায়নি। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর প্রভাব বরং কিছুটা পড়েছিল।

আনিসুজ্জামান লক্ষ করেছেন, স্যার সৈয়দ আহমদ ও সৈয়দ আমীর আলীর নতুন ভাব-আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয়, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রতি তাঁদের বৈরিতাও প্রশমিত হয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াস যেমন ছিল, তেমনি স্বাতন্ত্র্য চিন্তারও উন্মেষ প্রত্যক্ষ করা গেছে। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। আধুনিক কালের সমাজ আন্দোলনেও হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

হাজারদুয়ারির সামনে, সঙ্গে সস্ত্রীক লেখক

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, কালের ক্রমবিবর্তনে বাঙালি মুসলমান-মানসের যে রূপান্তর ঘটেছে, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*-এ, তার বস্তুনিষ্ঠ ও অনুন্ধানী পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনা আনিসুজ্জামানের অনন্য কৃতিত্ব।

এই সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা-কাজ করেছেন আনিসুজ্জামান। তাঁর *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রে* (১৮৩১-১৯৩০) ১৮৩১-এ বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা থেকে শুরু করে ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমানদের উদ্যোগে প্রকাশিত-প্রচারিত পত্রিকাগুলোর একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রণয়ণের চেষ্টা করেছেন তিনি। ১৮৩১ সালে প্রকাশিত 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'সেবকের বাণী' পর্যন্ত মোট একশত চল্লিশটি পত্রিকা ও সাময়িকপত্রের সন্ধান আমরা পেয়েছি এই তালিকায়।

এই তালিকা প্রণয়ন করে আনিসুজ্জামান বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যও জানিয়েছেন। মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' ছিল বাংলা-ফারসি দ্বিভাষিক পত্র। এর কারণও ছিল। ১৮৩৫ পর্যন্ত ফারসি ছিল রাজভাষা। শিক্ষিত মুসলমানরা ফারসিকে নিজেদের ভাষা বলে গণ্য করতেন। কালের পরিবর্তনে ও প্রয়োজনে অন্য ভাষায়ও পত্রিকা প্রকাশ করার তাগিদ দেখা গেল মুসলমানদের মধ্যে। কলকাতার মুসলমানদের জন্য উর্দু, অমুসলমানদের জন্য হিন্দি এবং ইংরেজি রাজভাষা হওয়ার পর এই ভাষারও স্থান হল 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' পত্রিকায়। প্রথম প্রকাশের পনেরো বছর পর বাংলা-ফারসির সঙ্গে উক্ত তিনটি ভাষা যুক্ত হয়ে 'সমাচার

সভারাজেন্দ্র’ প্রকাশিত হতে থাকে পাঁচটি ভাষায়। উর্দু-বাংলায় বেশ কিছু দ্বিভাষিক পত্রিকাও এই সময়ে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় পত্রিকা প্রকাশের ধারা প্রবল হয়ে ওঠে।

আনিসুজ্জামান শুধু পত্রিকাগুলোর তালিকাই করেননি, বিচার করেছেন এগুলোর ভাষা-বৈশিষ্ট্য; পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করারও প্রয়াসী হয়েছেন। ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’-এ প্রকাশিত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা না-গেলেও, পত্রিকার নাম থেকে তিনি অনুমান করেন, এর ভাষা ছিল, “তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ, পণ্ডিতী রীতির”। নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন, মুসলমান-সম্পাদিত দ্বিতীয় পত্রিকা ‘জগদুদ্দীপক ভাস্কর’-এর ভাষা ছিল অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ। ‘মহাম্মদী আখবর’-এর ভাষা ছিল দোভাষী রীতির সমগোত্র। ‘মিহির’ ও ‘হাফেজ’-এর ভাষা ছিল বাংলা সাধু গদ্যরীতির। পরবর্তীকালে ‘ধূমকেতু’ ও ‘শিখা’য় বাংলা কথ্যরীতির প্রতিষ্ঠা ঘটে। পত্রিকাগুলোর ভাষা বিচার করে আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, “আরবী-ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার যে মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল না, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।”

আনিসুজ্জামান কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করেছেন, ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’ বা ‘জগদুদ্দীপক ভাস্কর’-এর নামকরণে আরবি-ফারসি প্রভাব ছিলো না। এই পত্রিকা দু-টির নামকরণে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক চিহ্ন নেই। এই অবস্থার

পরিবর্তন ঘটে ওহাবী আন্দোলনের পরে। তখন থেকেই মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নামকরণে আরবি-ফারসির প্রভাব লক্ষ করা গেছে। 'মহাম্মদী আখবার', 'আখবারে এসলামীয়া', 'মুসলমান', 'মুসলমান-বন্ধু', 'ইসলাম'—এইসব পত্রিকার নামকরণে, তাঁর মতে, 'স্বতন্ত্র চিহ্ন' বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

উপরিউক্ত একশত বছরের বাঙালি মুসলমান-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোকে আনিসুজ্জামান ওই সময়ের বাঙালি মুসলমানের রাজনীতি-ইতিহাস ও জীবনচেতনার যে তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচ্য।

খিলাফত আন্দোলনের সময় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় 'হিজরত আন্দোলন'। ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষ ছেড়ে কোনো মুসলমান শাসনাধীন দেশে হিজরত করাই মুসলমানদের কর্তব্য—এই প্রেরণাই ছিল হিজরত আন্দোলনের মূলে। তবে এই ধরনের প্যানইসলামি চিন্তার বিরোধিতাও লক্ষ করা গেছে।

উপরিউক্ত সময়ের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য চেতনার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য চিন্তার যোগ ছিল কি? আনিসুজ্জামান মনে করেন, "তবু এই চেতনা সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের সন্ধান করে নি বলে মনে হয়।" বেশ কয়েকটি পত্রিকা এই সময় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করেছে। কোনো কোনো পত্রিকায় মুসলমানদের প্রতি

কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। সাধারণভাবে মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের সমর্থক হলেও, 'নবনূর'-এ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করা হয়।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রয়াসের বাণী কোনো কোনো লেখকের চিন্তায় ও রচনায় প্রকাশিত হলেও তা সম্ভব হয়নি। অনেকে এর জন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানকে দায়ী করেছেন। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নও এই সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে।

এই সময়ে মুসলমানগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সন্ধানের যে প্রয়াস করেছিলেন, তার মধ্যে ভাষার প্রশ্নে তাঁদের দ্বিধান্বিত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অনেক মুসলমান লেখক বাংলাকে হিন্দুর ভাষা বলে অভিহিত করেছেন, আবার বাঙালি হয়েও নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের মানসিকতার নিন্দাও করেছেন কেউ কেউ। মুসলমান সমাজে আরবি-ফারসির গুরুত্ব নিয়ে যেমন মত প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রমাণও এই সময়ে পরিলক্ষিত হয়।

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য এবং *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*-এ যথাক্রমে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যরচনায় ও তাঁদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় বাঙালি মুসলমানের মানসজগতের যে পরিচয় আনিসুজ্জামান অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন করেছেন, তারই ক্রমপরিণতি আমরা লক্ষ করি তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'স্বরূপের সন্ধানে' প্রবন্ধে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত জরুরি। আনিসুজ্জামান কেন *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* এবং *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*-এ বাঙালি মুসলমানের স্বরূপ

সন্ধান করেছিলেন? এর মধ্যে কি কোনো স্বাতন্ত্র্যচেতনা কাজ করেছিল? তাঁর গবেষণার পূর্বাপর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, কথিত স্বাতন্ত্র্যচেতনার পরিপোষকতা আনিসুজ্জামানের উদ্দেশ্য নয়। বাঙালি-মানসের যে পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পণ্ডিত-গবেষকের কাছ থেকে পেয়েছি, তাতে বাঙালি মুসলমানের মানসজগৎ প্রায় অনুপস্থিত। অথচ বাঙালি মুসলমান সমগ্র বাঙালিরই অংশ। তাঁদের জীবন ও মানসের সন্ধান না পেলে বাঙালি মানসের সমগ্রতার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। আনিসুজ্জামান বাঙালি মানসের সেই প্রত্যাশিত সমগ্র রূপই অন্বেষণ ও চিত্রিত করতে চেয়েছেন। এই সত্যটিই প্রতিভাত হয়েছে তাঁর 'স্বরূপের সন্ধানে' রচনায়।

তিনি বাঙালি মানসের স্বরূপ অন্বেষায় ব্রতী ছিলেন। আমাদের এই সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর 'স্বরূপের সন্ধানে' প্রবন্ধে। ১৯৭৫-এ আনিসুজ্জামান অক্সফোর্ডের Nuffield College-এ বাঙালি মুসলমানের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের মুসলমানের মানস ও তাঁদের স্বরূপ চেতনার বিবর্তন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তারই বাংলা অনুবাদ এই 'স্বরূপের সন্ধানে'। পরে Nuffield College-এ প্রদত্ত তাঁর মূল বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছে 'Towards a redefination of identity : East Bengal, 1947-71' শিরোনামে। 'স্বরূপের সন্ধানে' প্রবন্ধে পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ কীভাবে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে ভাষাগত পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

সিরাজ-উদ্‌দৌলার
সমাধির সামনে,
সঙ্গে সস্ত্রীক লেখক

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল শাসকদের পক্ষ থেকে। পূর্ববঙ্গের অনেক চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানি শাসকদের এই পরিকল্পনার তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমান মানসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শেকড় ক্রমশ দৃঢ় হতে শুরু করেছে। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে যে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো, নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছিলো, তা যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন আনিসুজ্জামান। পূর্ববঙ্গের জনগণ এবং সেই সঙ্গে পণ্ডিত-সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ কীভাবে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে সফল করে নিজেদের আত্মপরিচয়ের সঠিক রূপটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তারই একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ আমরা পেয়েছি এই প্রবন্ধে।

বাঙালির, বিশেষত বাঙালি মুসলমানের, স্বরূপ-অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি যে কোনো রকমের উগ্রজাতীয়তাবাদের আগ্রাসী মনোভাবকে পরিত্যাজ্য বিবেচনা করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদে তাঁর আস্থা ছিল, গবেষণালব্ধ উপাত্ত ও তথ্য ব্যবহার করে তিনি এই জাতীয়তাবাদের পক্ষে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন; কিন্তু এই প্রশ্নে সমাজে বিরাজমান অন্যান্য দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ এই পরিচয়ের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গণপরিষদে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ

তাঁদের চাকমা, মার্মা—ইত্যাদি পরিচয় বিসর্জন দিতে রাজি নন, তাঁরা 'জুম্ম জাতি' নামে পরিচিত হতে চান। এই প্রশ্নে আনিসুজ্জামান নীরব থাকেননি। সমস্যাটির গভীরতা ও যথার্থতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তাতে চাকমাদের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়—এই বাস্তবতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন :

> We cannot include them within the fold of either Bengalee nationalism or Bangladeshi nationalism as these have been formulated. [...]
>
> Whether the hillsmen are a conglomerate of tribes or a nation is a separate question altogether, but the fact remains that they are different from the plainsmen. These otherness must be respected even when they are few in number, even when it makes us less homogeneous.

পার্বত্য-জনগণের স্বকীয় জাতীয় চেতনার দিকটি আমরা অনেকেই উপলব্ধি করিনি। ফলে, এই সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিলো। আনিসুজ্জামান নিজে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একজন অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও উগ্র বা আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের ধারণাটি গ্রহণ করেননি। পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপজাতির সমন্বয়রূপে বিবেচনা করা বা তাঁদের একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নটি আলোচনা না করেও তিনি তাঁদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিতে চান। এর ফলে আমাদের জাতীয়

জীবনে সমধর্মিতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হলেও তা মেনে নেওয়া সঙ্গত বলেই মনে করেছেন। তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে উজ্জীবিত ও সফল করেছে তা সকলেরই, এমনকি পার্বত্য জনগোষ্ঠীরও সকলের মেনে নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন :

> It must also be acknowledged by all, including the hillsmen, that the War of Liberation was inspired by Bengalee nationalism that grew from strength to strength between 1952 and 1971.

আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় নিয়ে যতই তর্ক থাকুক না কেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ—এই সত্যটিই দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছেন আনিসুজ্জামান।

১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি আবার প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যার পর যাঁরা ক্ষমতাসীন হলেন তাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকল্প ও প্রতিদ্বন্দ্বী এক তত্ত্ব নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ১৯৭৬-এ বাংলা একাডেমির এক অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাংবাদিক খোন্দকার আবদুল হামিদ উত্থাপন করলেন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে'র তত্ত্ব। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে অন্যদেশের বাঙালিরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, কাজেই বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় পরিচয় হওয়া উচিত 'বাংলাদেশী'। খোন্দকার আবদুল হামিদের এই তত্ত্ব উত্থাপনের তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশ সরকার এক

ফরমান বলে সংবিধানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গায় প্রতিস্থাপন করলেন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। সরকারি ফরমানের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের এমন নজির বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। খোন্দকার আবদুল হামিদ 'বাংলাদেশী জাতীয়তা'র যে তত্ত্ব ও যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন তাতে আনিসুজ্জামান পরিত্যক্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই প্রসঙ্গে খোন্দকার আবদুল হামিদের বক্তব্যের কয়েকটি দিক উদ্ধৃত করা যায় :

> ১. 'বাঙালী' জাতীয়তা বললে মাল্টি-স্টেট ন্যাশনালিজম-এর কথা এসে পড়ে। কারণ, বাংলাদেশের বাইরেও কয়েক কোটি বাঙালী আছেন। আমরা কি সেসব বাঙালীকে বাংলাদেশের জাতির শামিল করতে পারি? জটিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রশ্নের ঝুঁকি না নিয়ে অমন [প্যানবেঙ্গলিজম বা সুপ্রান্যাশনালিজমের] কথা আমরা কি ভাবতে পারি? পারি না। আর তাই আমাদের জাতীয়তাকে 'বাঙালী জাতীয়তা' বলে অভিহিত করতে পারি না। করলে টেকনিক্যালি ভুল হবে, পলিটিক্যালি তা বিপজ্জনক হতে পারে।
>
> ২. বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ও অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষ একই 'স্টক' থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। উভয়ে বঙ্গ ভাষাভাষী হতে পারে, উভয়ে অন্নভোজী হতে পারে, উভয়ের মধ্যে আচার আচরণেও খানিকটা মিল থাকতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতিতে, জাতীয় সত্তায়, জাতীয় ভাবাদর্শে তারা কি এক, অভিন্ন? নিশ্চয়ই তা নয়। বরং অনেক দিক দিয়ে ভিন্ন এবং কতক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। [...]

> ৩. কাজেই ‘বাঙালী জাতীয়তা’ কথাটা শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও অবাস্তব। এমনকি রাজনৈতিক দর্শন হিসাবেও এর অসারতা স্বপ্রমাণিত। ‘বাঙালী জাতীয়তা’ তাই মিসনোমার। আমাদের জাতীয়তাকে ‘বাংলাদেশী জাতীয়তা’ বলাই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা সঙ্গত।

খোন্দকার আবদুল হামিদের এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পাওয়া যাবে আবুল মনসুর আহমদের মতো অনেকের রচনায় ও মনোভাবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে আদর্শ ও প্রেরণায় চালিত হয়েছিল, এই তত্ত্বে ছিল তার সচেতন বিরোধিতা। আনিসুজ্জামান এই তত্ত্ব ও মনোভাবের যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন :

> এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না , যে এই বক্তব্যের মূলে কাজ করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা। বাংলাদেশের যে সব অধিবাসী বাংলাভাষী নন, আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে তাঁদের টেনে আনার কোনো প্রয়োজনীয়তা এতে ব্যক্ত হয়নি। যা এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে, তা হল অনুক্ত হিন্দু ও অকথিত মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য। ১৯৭১-এর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে দ্বিজাতিভিত্তিক এই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ উপস্থাপিত হয়েছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রসঙ্গ এতে স্থান পায়নি, পাওয়ার কথাও নয়।

এইসব গবেষণায় তাঁর চিন্তা ও মানসপ্রবণতার কথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু এর বাইরেও তিনি আরও অনেক বিষয়ে ভেবেছেন, গবেষণা করেছেন।

আনিসুজ্জামান ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় হাজার চারেক চিঠি ও

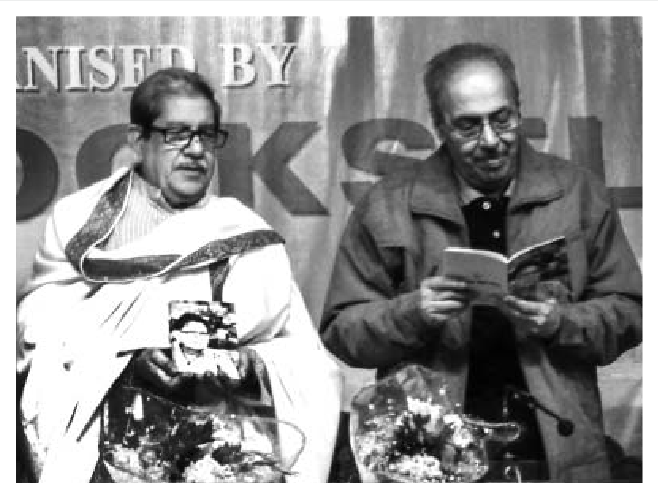

কলকাতা বইমেলায় একটি পুস্তক-উদ্বোধনী মঞ্চে
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

দলিল আবিষ্কার করেছেন। বাংলা গদ্যরচনার এই বিপুল সংগ্রহ শুধু আবিষ্কারের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বাংলা গদ্যের ইতিহাস সম্পর্কেও এই চিঠি-দলিলের সংগ্রহ একটি নতুন সিদ্ধান্তের ইংগিত দিয়েছে। এছাড়া বাংলার সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত অর্থনৈতিক ইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক এর ফলে উন্মোচিত হয়েছে। এই চিঠি ও দলিলগুলোর একটি বিবরণধর্মী তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন তিনি *Factory Correspondence and Other Bengali Documents in the India Office Library and Records* নামে। এই তালিকা করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান প্রাপ্ত চিঠিপত্র ও দলিলগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। ১৭৭৪ থেকে ১৮১৪—এই চল্লিশ বছরের প্রায় চার হাজার চিঠি ও দলিল আছে এই সংগ্রহে। বাংলা ভাষায় লেখা এত বিপুল সংখ্যক চিঠি ও দলিলের সংগ্রহ এর আগে পাওয়া যায়নি। এরমধ্যে দু'হাজার মামলার দলিল পাওয়া গেল। এই দলিলগুলো যে সময়ের, সেই সময় আদালতে তিনটি ভাষা প্রচলিত ছিল। মামলার সওয়াল-জওয়াব হত বাংলা ভাষায়, জুরিগণ তাঁদের মতামত দিতেন ফারসিতে আর বিচারক তাঁর রায় প্রকাশ করতেন ইংরেজিতে। আর ইংরেজদের বস্ত্রউৎপাদন কারখানা ও আড়ং-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হত সেরকম প্রায় দু'হাজার চিঠি পাওয়া গেল এই সংগ্রহে। আবিষ্কৃত চিঠিপত্র-দলিলের কয়েকটি সংকলিত হয়েছে তাঁর *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* বইতে। এইসব চিঠি ও দলিলের ভাষা বিচার করে তাঁর *পুরোনো বাংলা গদ্য* বইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাংলা গদ্যের উদ্ভাবন ও প্রচলনে ফোর্ট

উইলিয়াম-পণ্ডিতদের ভূমিকার বিষয়টি ইতিপূর্বে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে বলা হত, প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

ফোর্ট উইলিয়াম-পণ্ডিতদের বাংলা গদ্য রচনা প্রয়াসের আগেও বাংলা গদ্যের একটি প্রাঞ্জল ধারা ছিল। আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ব্যাবহার শুধু চিঠিপত্র বা দলিল-দস্তাবেজে সীমাবদ্ধ ছিল—এরকম ধারণাই পোষণ করতেন অনেকেই। আনিসুজ্জামান এই ধারণাটি নতুনভাবে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। বাংলা গদ্য ব্যবহারের বিভিন্ন নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ধর্মসাধনার তত্ত্বগত দিকও বাংলা গদ্যে রচিত হয়েছে। ষোড়শ শতক থেকে বাংলা গদ্যের যে নমুনাগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিচার করেছেন আনিসুজ্জামান। *শূন্যপুরাণ, সেকশুভোদয়া,* শঙ্করদেবের নাটকসমূহ, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোম-নৃপতি চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে লিখিত কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের পত্র, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের গদ্যরচনা ও সপ্তম শতকের কয়েকটি রচনার ভাষা বিচার করেছেন তিনি বাংলা গদ্যের উদ্ভবপর্ব সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশের প্রমাণ ও যুক্তি হিসেবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আনিসুজ্জামান ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে *স্বরোদয়* নামে একটি রচনার দু-টি পুথির সন্ধান পেয়েছিলেন, ব্লুমহার্টের পুথি-তালিকাসূত্রে। *স্বরোদয়* মূলত একটি সংস্কৃত রচনার অনুবাদ। এর রচয়িতা হিসেবে ব্লুমহার্ট উল্লেখ করেছেন দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র অনন্তধামের নাম। আনিসুজ্জামানের অনুসন্ধানে দেখা গেছে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর

পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সাত সন্তানের মধ্যে অনন্তধন নামের কেউ ছিলেন না। অনন্তধন নামে মুর্শিদ কুলি খাঁর একজন কানুনগো ছিলেন। *স্বরোদয়* তাঁর রচনা হলে, এটি অষ্টাদশ শতকে রচিত ও লিপিকৃত হতে পারে। ব্লুমহার্টও এর লিপিকাল অষ্টাদশ শতক বলে উল্লেখ করেছেন, তবে এর রচনাকাল উল্লেখ করেননি। কিন্তু পুথির ভণিতায় "বর্ত্তমানয়ে যে লিখে ১৪৫০ শকে"—এই তথ্যের ভিত্তিতে আনিসুজ্জামান মনে করেন, এর রচনাকাল ১৪৫০ শকাব্দ বা ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দ। এর ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্ত *স্বরোদয়ই* বাংলায় রচিত প্রথম গদ্য-নিদর্শন। সুকুমার সেনের সূত্রে এতদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোম-নৃপতি চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে লিখিত কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের পত্রই বাংলা গদ্যরচনার প্রাচীনতম নিদর্শন। আনিসুজ্জামানের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে *স্বরোদয়*-কেই প্রাচীনতম বাংলা গদ্যরচনার নিদর্শন হিসেবে স্বীকার করে নিতে হয়। এই পুথির কোনো সাহিত্যিক মূল্য না-থাকলেও, আনিসুজ্জামান মনে করেন, পদ্যরচনার যুগে গদ্যে রচিত একটি পুথি হিসেবে এটি টিকে থাকবে:

> In the process was made a work of prose in the age of poetry. The work has no literary merit. It has survived by accident. It may survive as the earliest specimen of Bengal prose.

বৈষ্ণবদের কিছু তাত্ত্বিক রচনার সন্ধানও পাওয়া গেছে গদ্যে। বাংলা গদ্যের বিকাশধারা পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে :

> বৌদ্ধ সহজযানী সাধকেরা যেমন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন, ভাবের গদ্যরচনায় তেমনি পথিকৃৎ ছিলেন বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকেরা।

আনিসুজ্জামানের পূর্বেও বাংলা গদ্যের বেশকিছু নিদর্শন আমরা পেয়েছি। শিবরতন মিত্র, ডা. সুরেন্দ্রনাথ সেন, পঞ্চানন মণ্ডল, ও সুধাংশু তুঙ্গ প্রাচীন বাংলা গদ্যের সংকলন প্রকাশ করেছেন। সুধাংশু তুঙ্গের সংকলনে আমরা পেয়েছি অসমে প্রাপ্ত বাংলা গদ্যের কিছু নিদর্শন। *সুরুল নথি* সংকলনেও বেশ কিছু বাংলা গদ্যের নিদর্শন আছে। কিন্তু সংখ্যার বিপুলতায় আনিসুজ্জামানের *Factory Correspondence and Other Bengali Documents in the India Office Library and Records*-এ উল্লেখিত বাংলা দলিল ও চিঠি অনেক সমৃদ্ধ। এগুলোর সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও এই সঙ্গে স্মর্তব্য।

Factory Correspondence and Other Bengali Documents in the India Office Library and Records-এ উল্লেখিত চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের ভাষা বিচারও করেছেন তিনি। ইংরেজ-রচিত বাংলা রচনাসমূহের গদ্যভঙ্গিও বিচার করেছেন। চিঠিগুলোর ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করলেন, ফ্যাক্টরির উর্ধতন কর্মকর্তা ও আড়ং-এর অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যকার এই চিঠিগুলো অনেকটা আনুষ্ঠানিক পত্রের মতোই। ফারসি শব্দ ও বাকভঙ্গির প্রভাব আছে চিঠিগুলোতে। আরবি ও হিন্দুস্তানি শব্দও আছে, পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দ ও বাকভঙ্গিও দুর্লক্ষ নয়। চিঠিগুলোর ইরেজি সারসংক্ষেপেও ফারসি-আরবি ও হিন্দুস্তানি শব্দের

ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে, যেমন: আমানত, ফাজিল, দরখাস্ত, রকমফের—ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিককার ভাষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই চিঠিপত্র ও দলিলগুলোর বিপুলতা ও ভাষা বৈশিষ্ট্য বিচার করে, বাংলা গদ্যের সূচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত তা খণ্ডন করে আনিসুজ্জামান বলেছেন:

> নতুন দিনের সমারোহ পুরোনোকে সহজেই ভুলিয়ে দিল। এমন করে ভুলিয়ে দিল যে নতুন দিন যে প্রথম দিন নয়, সেকথা এখন নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি। চিঠিগুলোতে প্রাপ্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে আনিসুজ্জামান বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি দিক উন্মোচন করেছেন। ইংরেজ বেনিয়াদের কৌশল ও ষড়যন্ত্রে বঙ্গের তাঁতিগণ কীভাবে ক্রমশ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছেন তার একটি প্রামাণ্য ও যুক্তিনির্ভর বিবরণও রচনা করেছেন তিনি। দেবেন্দ্র বিজয় মিত্রের *Cotton Weavers of Bengal*-এ আমরা বাংলার বস্ত্রশিল্প ও তাঁতিদের বিনাশের বিবরণ পেয়েছি। হামিদা হোসেনও এই নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু আনিসুজ্জামান বস্ত্রউৎপাদন-কারখানা ও আড়ং-এর মধ্যকার চিঠিপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত যে মৌলিক ও প্রত্যক্ষ উপাদান-উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহের মঞ্চে
রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও পবিত্র সরকারের সঙ্গে

অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই দিকটি উন্মোচন করেছেন বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষক শিক্ষক হিসেবে আনিসুজ্জামানের অবদান ও ভূমিকা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। গবেষণাকে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় সীমিত না রেখে তিনি এর উপযোগিতার কথা ভেবেছেন। আমাদের জাতীয়, সামাজিক বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অনুসন্ধানের বিষয়গুলো তাঁর মনোযোগ এড়ায়নি। তিনি সমাজের ও দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গভীর অনুসন্ধানী ও নিরাসক্ত গবেষকের দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সমাজে উত্থাপিত নানা প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বে মীমাংসা প্রদানের চেষ্টা করেছেন।

ব্যক্তিগত ও আদর্শগত বিশ্বাসে তিনি ছিলেন স্বচ্ছ ও সুসঙ্গত। অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনার অধিকারী ছিলেন তিনি। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসৃত হবে—এই প্রত্যয় ছিল তাঁর। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে এসে যখন দেখলেন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে বাংলাদেশ দূরে সরে যাচ্ছে, তখন তিনি বিচলিত বোধ করেছেন। এর বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয়ও ছিলেন। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিরুদ্ধে মামলায় অন্যতম বাদী তিনি। একাত্তর সালের একজন গণহত্যাকারীর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি। এর ফলে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলো, কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হননি। এই সম্পর্কে প্রকাশ্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, সভায় বক্তৃতা করেছেন, একই সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও স্বরূপ নিয়ে গবেষণাও করেছেন। এ-ই ছিল আনিসুজ্জামানের বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী পিটার লেওনার্দের মত বিচার করে বলেছেন, "সব ভাবাদর্শের সঙ্গেই শ্রেণীস্বার্থের কিছু না কিছু যোগ থাকে।" এডওয়ার্ড শিলসের মত বিচার করে পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রাধান্যের পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কীভাবে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে তা-ও বিচার করেছেন।

আমরা ১৯৭৫-উত্তর সরকারগুলোর বাঙালি জাতীয়তা-বাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা লক্ষ করেছি। এই জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করে প্রচ্ছন্নভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের পুনরুত্থান ঘটেছে। কিন্তু এই প্রবণতার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুসারীরাও খুব একটা সফল রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলেনি—এই নিয়ে আনিসুজ্জামান আক্ষেপ করেছেন। ভোট ও জনতুষ্টির পথ অবলম্বন করেছেন সকলেই। বাংলাদেশের সংবিধানের সূচনায় যুক্ত হয়েছে 'বিসিমিল্লাহির-রহমানির রহিম' এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর বিরোধিতা করে কোনো আন্দোলন করেনি 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দলগুলো। এমনকি আওয়ামি লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মতো দলগুলোও, নির্বাচনী কৌশল হিসেবে ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে জনতুষ্টির পথ ধরেছে। এই প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেছেন :

> During the election campaign in 1991, it was propagated with a good measure of success that the Awami League's

> return to power would lead to the deletion of *Bismillah* from the Constitution. Such was the force of the campaign that Awami League panicked. They did not foresake secularism but raised the slogan of *Allahu Akbar* in their processions and meetings and also had it printed on posters and leaflets. Allahu Akbar also appeared on the election posters of the Communist Party of Bangladesh which had held *milad mahfil* in their office.

ধর্মকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করার ফলে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে নানা ধরনের অনৈক্যের বীজ রোপিত হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে ভীতি ও হীনম্মন্যতা দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের আধিপত্যের কারণে সংখ্যালঘুদের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যচেতনার উন্মেষ ঘটেছে। এই বিষয়টি আনিসুজ্জামান উপলব্ধি করেছেন :

> On the other hand, the majoritarian domination, if one may call it so, is giving rise to minoratarion separatism. The religious minorities are combining themselves as a different entity from the Muslims. The demand to have proportional representation in government employment etc. has been made, and some leaders of the minority communities are, I know, thinking in terms of demanding separate electorate.

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ যে আদর্শ অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করেছিল, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে সম্পৃক্ত

করার ফলে তা আজ প্রায় ম্রিয়মাণ হতে চলেছে। আনিসুজ্জামান মনে করেন, যারা সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অপসারণ করে একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা বাংলাদেশকে কার্যত একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। ধর্ম ও রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করার বিপদ আমরা পাকিস্তান আমলে প্রত্যক্ষ করেছি। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, আনিসুজ্জামান মনে করেন, আমাদের রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের উচিত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবার সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন:

> If our predecessors had the boldness to say, even in the early years of Pakistan, that the two-nation theory was incorrect, or, atleast, unnecessary, why can not we stand for secularism now? Those who fought to make Bengali a state language did not have a large mass backing in 1948. Yet they stood by their conviction and, finally, got the overwhelming support.

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশকে প্রকৃত অর্থেই একটি অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, "দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার—তাকে রাজনীতিতে টেনে আনলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। বাংলাদেশের কল্যাণের সঙ্গে এই আদর্শ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"

গবেষক হিসেবে আনিসুজ্জামান যেমন অনুসন্ধানী ও বস্তুনিষ্ঠ, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের বাস্তবায়নে তেমনি দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। কর্তব্যে এরকম সচেতন, নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় মানুষ আমাদের সমাজে বিরল।

আনিসুজ্জামানের প্রধান পরিচয়—তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসেবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চাননি। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাফল্য ও খ্যাতি ছিল কিংবদন্তিতুল্য। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বিশ্বভারতীতেও অতিথি অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান তো পেয়েছেনই, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও পেয়েছেন। অধ্যাপকের নিয়মিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হয়েছেন সুপারনিউমারারি অধ্যাপক। এরপর হলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক। সবশেষে বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক পদেও বৃত হলেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা শ্রেণিকক্ষের সীমা ছাড়িয়েছিল। প্রকৃত অর্থেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জাতির শিক্ষক ও বিবেক। দেশ ও জাতির যে কোনো সংকটে তাঁর পরামর্শ ছিল আমাদের পাথেয়।

আলোকচিত্রগুলি লেখকের সংগ্রহ থেকে ব্যবহৃত।

লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অধ্যাপক-নিয়োগের নীতিমালা ব্যাখ্যা করার দাবি জানালো। তাদের পর্যবেক্ষণ: 'বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু হয়েছে। ...কেউ কেউ ব্যক্তিগত পদোন্নতি ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষায় দলাদলি করার চেষ্টা করছেন, [illegible] ছাত্রদেরকেও তাঁদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন। কর্তৃপক্ষও [illegible] ভূমিকা গ্রহণ করছেন না, বরং দলাদলির সুযোগ করে দিচ্ছেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সাধারণ ছাত্রদের নামে মুদ্রিত একটি প্রচারপত্র এ-সময়ে বিতরণ করা হলো। তার ভাষা বেশ অগ্নিগর্ভ। মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, মীর্জা নূরুল হুদা, আব্দুর রাজ্জাক ও সৈয়দ আলী আহসান তার আক্রমণের লক্ষ্য—আমি তো আছিই। এবারে আমি বিচলিত না হয়ে পারলাম না। আমার কারণে আমার শ্রদ্ধেয় মানুষেরা এভাবে অপমানিত হবেন, তা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগতে লাগলো। ভাবলাম, যথেষ্ট হয়েছে, এবারে জনসমক্ষে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা দরকার যে, এই

> অশ্লীলতা, সহিংসতা ও বিভীষিকা থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা রাষ্ট্র আপন কর্তব্য বলে মনে করে।

কনিষ্ঠ আবদুল খালেককে। তিনি বাড়িতেই বেশির ভাগ থাকেন—ছাত্রদের রোষের ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি আমার সঙ্গে একমত। তবে কারণটা একটু ভিন্ন: 'আপনার সারের বউ-বাচ্চা নাই, দুনিয়াদারির খবর নাই—তার কথা আলাদা। আপনে ক্যান এই রিস্কের মধ্যে যাইবেন? যা দিনকাল, বলা যায় না।'

সেদিন নভেম্বরের ২ তারিখ। আমাদের অগ্রজপ্রতীম বন্ধু, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, জয়নুল আবেদীন দীর্ঘ রোগভোগের পর মারা গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ-প্রাঙ্গণে বাদ আসর জানাজা। গণপরিষদ ভবন থেকে সেখানে এলাম এবং যেমন ভেবেছি, রাজ্জাক স্যারকেও পেয়ে গেলাম। জানাজার পরে সার্‌কে বললাম, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' উনি জানতে চাইলেন, গাড়ি আছে? হাঁ-সূচক উত্তর শুনে বললেন, 'তবে কামালের বাড়ি চলেন।' যেতে যেতে আমার কথাটা বললাম। বিবৃতির খসড়া আমার

গো লা ম মু র শি দ

আমার শিক্ষক আনিসুজ্জামান

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ১৪ মে বিকেল পাঁচটার দিকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। তিনি ছিলেন আমার থেকে মাত্র সোয়া দু-বছরের বড়ো। সহপাঠী হলেও সেটা অসম্ভব হত না। কিন্তু না, আমার যে ক-জন শিক্ষককে আমি শিক্ষক বলে সবচেয়ে উচ্চাসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা করেছি, তিনি তাঁদের একজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না; যে-মানুষ গৌরব পায় সে-ই গুরু হয়। তিনি গৌরবের অধিকারী হয়ে গুরু হয়েছিলেন। তাঁকে দেখলে এমনিতেই মাথা নত হয়ে যেত।

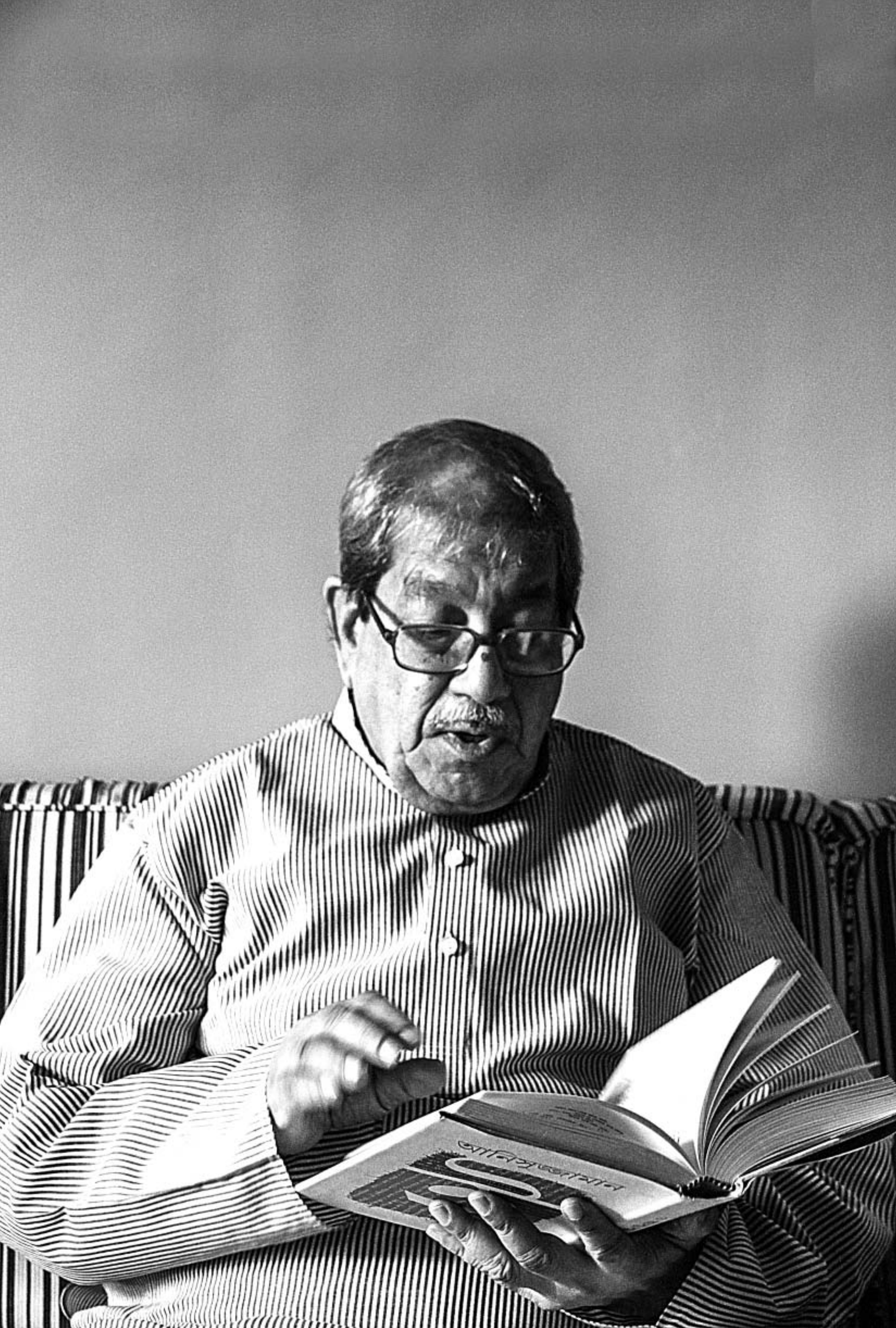

কিন্তু তাঁর পরিচয় কেবল শিক্ষক হিসেবে নয়। তাঁর আর-একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং সমাজহিতৈষী একজন অসামান্য মানুষ। যেকালে মানুষকে অনায়াসে কিনে নেওয়া যায় অর্থ দিয়ে, উচ্চপদে বসিয়ে, পুরস্কার দিয়ে, সেই গ্রহণগ্রস্তকালে তিনি ছিলেন একজন আপসহীন অকুতোভয় চির-উন্নতশির মানুষ। যখন সবাই ক্রীতদাসের হাসি হেসে 'জি হুজুর' বলে কুর্নিশ দিতে ব্যস্ত, তখন তিনি নির্ভীক সমাজ-বিবেক হিসেবে এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হোক, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বিপর্যস্ত বাংলাদেশে হোক, বন্দুক-ওঁচানো শাসন-কালে হোক, নৈরাজ্য-কালে হোক, দালাল-রাজাকারদের পতাকা-ওড়ানো কালে গণ-আদালতে হোক, তিনি বারংবার সমাজ-সৈনিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। সংকট-কালে তিনি পালন করেছেন বিবেকের দায়িত্ব পালন।

কিন্তু একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে এবং পণ্ডিত হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, সে-কথা লেখার মানুষ অনেক আছেন, আমি লিখব তাঁকে কাছ থেকে একজন শিক্ষক এবং মানুষ হিসেবে যেমনটা দেখেছি।

যে-যুগে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে, অধ্যাপকের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, নীরন্ধ্র অন্ধকারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যা লয় প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সংকটকালে যে-স্বল্পসংখ্যক মনীষী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আলোকিত করে রেখেছিলেন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন তাঁদেরই একজন।

কিন্তু আমি তাঁর একেবারে পেছনের কাতারের ছাত্র। তাঁর পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন করা দূরে থাক, তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে আলোচনা করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। মানুষ ও শিক্ষক হিসেবে তাঁকে যেমনটা দেখেছি, কেবল সে-সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

মনে আছে গ্রাম-থেকে-আসা মুখচোরা এবং লাজুক যুবক হিসেবে বাংলা বিভাগের সমস্ত শিক্ষকের কাছ থেকে আমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আনিস স্যার আমাকে সামনে টেনে এনেছিলেন। মনে পড়ে এমএ চূড়ান্ত পরীক্ষায় আমি দৈবক্রমে প্রথম হয়েছিলাম। কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশিত হবার পর বিভাগের কোনো শিক্ষক চিনতে পারলেন না আমি কে। কেবল আনিস স্যার বললেন, তিনি আমাকে চেনেন। তারপর থেকে কতবার যে-আমি তাঁর কাছে সাহায্য নিয়েছি, তার হিসাব নেই। মনে আছে, আমার প্রথম বই *বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক*-এর পাণ্ডুলিপি আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। তিনি সবটা দেখে মৃদু হেসে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছিলেন যে, *বৈষ্ণব পদাবলী*-র এমন গোত্র-ছাড়া ব্যাখ্যা অন্য কেউই দেয়নি। আমার প্রিয় শিক্ষক আহমদ শরীফ স্যার তো রীতিমতো তিরস্কার করে আমার লেখাটি কিচ্ছু হয়নি বলে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

আমার পিএইচডি অভিসন্দর্ভ যখন রচনা করি, তখনো তিনি তা আগাগোড়া পড়ে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়েছিলেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্যার সপরিবারে কলকাতায় ছিলেন। আমিও ছিলাম সপরিবারে। তখন পেট চালানোর জন্যে আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আর 'দেশ' পত্রিকায় প্রায় চল্লিশটি

লেখা প্রকাশ করেছিলাম। এসবের মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক পটভূমি নিয়ে পাঁচ কিস্তির একটি রচনা, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’-কে জাতীয় সংগীত করার পক্ষে দুই কিস্তিতে একটি রচনা, ‘ছায়ানট’ নিয়ে একটি লেখা ইত্যাদি। এখনো মনে আছে এই লেখাগুলোর অনেকটাই লিখতে আনিস স্যারের সাহায্য নিয়েছিলাম। স্যার অকৃপণভাবে সহায়তা করেছেন।

অনেক বছর পরে যখন ‘দেশ’ পত্রিকায় আমার *আশার ছলনে ভুলি:* মাইকেল-জীবনী বইটি সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনও তাঁকে লেখাটির একটা অংশ পড়তে দিয়েছিলাম। স্যার তা পড়ে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়েছিলেন। আমার ধারণা, এরকমের সাহায্য তিনি তাঁর অন্য ছাত্রদেরও করতেন। কারণ, সাহায্য এবং উপকার করার মনোভাব ছিল তাঁর সহজাত। এ ছিল তাঁর উদার চরিত্রের অচ্ছেদ্য অংশ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ‘বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা’ দেওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল ১৯৭২-এ। সেখানে যে-বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলাম, তা *রবীন্দ্রমানস ও সৃষ্টিকর্মে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা* নামে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সে-পাণ্ডুলিপিটিও স্যার পড়ে দেখে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য, গবেষণা, সামাজিক ভূমিকা পালন ইত্যাদির থেকেও যে-কারণে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তা হল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতো এমন অমায়িক, মিষ্টিভাষী এবং অন্যের উপকার করতে সর্বদা প্রস্তুত মানুষ আমি আর দেখিনি। আমরা

যারা সাধারণ মানুষ, তারা একান্ত বন্ধুর প্রতিও সঙিন উঁচিয়ে থাকি, পেছনে নিন্দায় পঞ্চমুখ হই। অপর পক্ষে, তিনি শত্রুর প্রতিও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে থাকতেন। এমন অজাতশত্রু এ যুগে একান্ত বিরল। সেই বিরল মানুষটিও চলে গেলেন।

আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পর তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। সত্যিকার অর্থে তাঁর সঙ্গে এই যোগাযোগ থেকে আমি অত্যন্ত লাভবান হয়েছি। আমি বস্তুত গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে তাঁর ছাত্রই রয়ে গেছি। আপসোসের বিষয় তিনি যতটা দিয়েছিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ততটা নিতে পারিনি।

প্রতিভাবান লোকেদের অনেকেই উৎকেন্দ্রিক হন। কিন্তু অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও অসাধারণ প্রতিভাবান হলেও, আশ্চর্যজনকভাবে আর-পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো। তাঁর মতো এমন নিরহংকার, নিজেকে জাহির না-করা, বিনয়ী, মৃদুভাষী, আপাদমস্তক ভদ্রলোক আমি খুবই কম দেখেছি। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সচরাচর যুক্ত অসহিষ্ণুতা অথবা অহংকার ছিল না। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আর-একটা কথা না-বলে পারা যায় না—এই বিশেষজ্ঞতার যুগে অনেক ক্ষেত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যও সীমাবদ্ধ থাকে একটা গণ্ডির মধ্যে। অধ্যাপক আনিসুজজ্জামানে পাণ্ডিত্য সে-রকম সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বিবিধ বিষয় নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন। বিবিসির পক্ষ থেকে আমি বহুবার নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে। প্রতিবারই লক্ষ করেছি, তিনি তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন। সেই সঙ্গে দিতেন নিজের মৌলিক পর্যবেক্ষণ।

তাঁর পাণ্ডিত্য এবং ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্যে তিনি দেশ-বিদেশের বহু স্বীকৃতিও লাভ করেছিলেন। এবং বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু পুরস্কার আজকাল মূল্যহীন—অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। পুরস্কার-প্রাপ্তদের নাম পর্যন্ত লোকেরা জানে না। অপর পক্ষে, আনিস স্যার পুরস্কার পেয়ে পুরস্কারগুলোকে গৌরব দান করেছিলেন। আমরা অমর কথাটা এখন যত্রতত্র ব্যবহার করে শব্দটাকে মূল্যহীন করে ফেলেছি। তবু সেই অমর শব্দটি দিয়েই বলব, পণ্ডিত হিসেবে, সমাজ-বিবেক হিসেবে এবং সর্বোপরি একজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি বহুকাল টিকে থাকবে। তাঁর একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ।

লেখক বিশিষ্ট গবেষক, প্রাবন্ধিক ও আভিধানিক।

হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব বা সমন্বয়েরও কিছু আভাস মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আছে। *সত্যপীরের পুঁথি* তার নমুনা। মধ্যযুগীর আদর্শে লেখা অথচ মিশ্র ভাষারীতির রচিত, এমন আরেকটি কাব্য *গাজী কালু ও চম্পাবতী*তে হিন্দু-মুসলমানের আপাতবিরোধের অন্তরালে দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ মিলনের পরিচয় পাই। এই ভাবধারার পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটেছে বাউল গানে। যেকালে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখার আন্দোলন চলছিল, সেকালে এই সমন্বয়পন্থি ধারার অস্তিত্ব আমাদের একটি প্রবণতার পরিচয় দেয়।

বটতলার ছাপাখানা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত দু-একটি বইতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের প্রচেষ্টা আছে। তবে প্রায়-অশিক্ষিত লেখকদের হাতে এর রূপায়ণ সার্থক হতে পারে নি। সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে বাস্তবতা সম্পর্কে যে-সচেতনতার পরিচয় পাই তা উত্তরকালের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির পথনির্মাণ করেছে।

১৮৭০ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম যুগ। তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া প্রভৃতি ভাব-আন্দোলনের প্রভাব সাধারণভাবে এযুগেও দেখি না—যদিও কোনো কোনো লেখক হয়তো এই

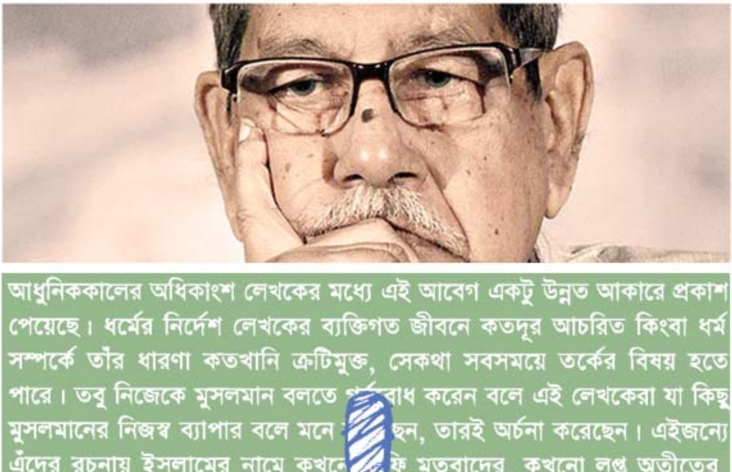

আধুনিককালের অধিকাংশ লেখকের মধ্যে এই আবেগ একটু উন্নত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মের নির্দেশ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে কতদূর আচরিত কিংবা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতখানি ত্রুটিমুক্ত, সেকথা সবসময়ে তর্কের বিষয় হতে পারে। তবু নিজেকে মুসলমান বলতে গর্ববোধ করেন বলে এই লেখকেরা যা কিছু মুসলমানের নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করেছেন, তারই অর্চনা করেছেন। এইজন্যে এঁদের রচনায় ইসলামের নামে কখনো সুফি মতবাদের, কখনো লুপ্ত অতীতের, কখনো তুরস্কের পতনোম্মুখ সাম্রাজ্যের আর কখনো বৃথা ঐতিহ্যগর্বের প্রকাশ হয়েছে। এই প্রবণতার জন্যেই অধিকাংশ লেখক বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাইতে অতীতের গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। সেই অতীতের ব্যাখ্যায় তাঁরা যে-ভাবধারার পরিচয় দেন, তা আমির আলির চিন্তাধারারই সগোত্র।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা

একটি চিঠি

আনিসুজ্জামানের রবীন্দ্র-অনুরাগ সকলেরই জানা। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আজও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাই *বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা* গ্রন্থটি আষাঢ় ১৪০০ (জুন ১৯৯৩)-এ 'বাংলা একাডেমী, ঢাকা' থেকে প্রকাশের পর লেখক ভূঁইয়া ইকবাল (বিশিষ্ট গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) সেটি পড়ে দেখার জন্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে উপহার পাঠান। বইটি পড়ে তিনি তাঁর অনুভূতি একটি চিঠিতে লিখে পাঠান লেখককে। অপ্রকাশিত সে-চিঠিটি মুদ্রিত হল ভূঁইয়া ইকবালের সৌজন্যে।

আনিসুজ্জামান
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০ ফোন ৫০০৩৪৬

৩২ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাস
ঢাকা ১০০০ ফোন ৫০৪৭৯৭

৮ নভেম্বর ১৯৯৬

কল্যাণীয়েষু,

ইতিমধ্যে, তোমার 'বাংলাদেশে রবীন্দ্র সংবর্ধনা' বেশ ভালো হয়েছে। শুধু এ-সম্পর্কে যে-কয়েকটি কথা মনে এলো, তাই লিখছি।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বইতে প্রকাশিত হয়েছে বলে কিংবা মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের বইতে প্রকাশিত হবে বলে কিছু উপকরণ এ-বইতে ব্যবহার করো নি। এখন যদি তোমার বইয়ের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তা ব্যবহার করা উচিত। নইলে পাঠকের অতৃপ্তি থাকে— তাকে পাঁচটি বইয়ের খোঁজ করতে হয়। সে-কথা মানছ তো।

"এই কথাটি মনে রেখো" গানটি সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তির উক্তি ছাপার অক্ষরে স্থান পেয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' - দ্বিতীয় খণ্ডে - দেখছি গানটি লেখা হয় শান্তিনিকেতনে, ১৩২৮-এর শরৎকালের শেষে। 'বসন্তিকা'র জন্যে ওটি শান্তিদেবের কাছে, কিন্তু ছাপা হয় নি - সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ও-গানের যে-অর্থ সচরাচর করা হয়, তাতে তা 'গীতবিতানে' প্রেম-পর্যায়ভুক্ত হতো না। অবশ্য গীতবিতানের বিন্যাস সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

আশা করি, অনিন্দ্য, টুকু ও তুমি ভালো আছ। তোমাদের কাছ থেকে বহু সময় অপেক্ষায় থেকেছি, সকলে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

শুভার্থী
আনিসুজ্জামান

পুনঃ। সমকালের প্যাকেটটা সেঁটে দিয়েছি।

আনিসুজ্জামান
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০ ফোন ৫০০৩৪৬

৩২ ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাস
ঢাকা ১০০০ ফোন ৫০৪৭৯৭
৮ নভেম্বর ১৯৯৩

কল্যাণীয়েষু,

ইকবাল, তোমার 'বাংলাদেশে রবীন্দ্র সংবর্ধনা' বেশ ভালো হয়েছে। তবু এ-প্রসঙ্গে যে-কয়েকটি কথা মনে এলো, তাই লিখছি।

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের বইতে প্রকাশিত হয়েছে বলে কিংবা মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের বইতে প্রকাশিত হবে বলে কিছু উপকরণ এ-বইতে ব্যবহার করো নি। এসব যদি তোমার বইয়ের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তা ব্যবহার করা উচিত। নইলে পাঠকের অতৃপ্তি থাকে—তাকে পাঁচটা বইয়ের খোঁজ করতে হয়। সে-কাজ গবেষকের।

"এই কথাটি মনে রেখো" গানটি সম্বন্ধে অনেক বিভ্রান্তিকর উক্তি ছাপার অক্ষরে স্থান পেয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী'—দ্বিতীয় খণ্ডে—দেখবে গানটি লেখা হয় শান্তিনিকেতনে, ১৩২৮ এর শরৎকালের শেষে। 'বাসন্তিকা'র জন্য ওটা পাঠিয়েছিলেন কবি, কিন্তু ছাপা হয় নি—সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ও-গানের যে-অর্থ সচরাচর করা হয়, তাতে তা 'গীতবিতানে' প্রেম-পর্যায়ভুক্ত হতো না। অবশ্য গীতবিতানের বিন্যাস গানগুলি সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

আশা করি, অনিন্দ্য, টুকু ও তুমি ভালো আছ। তোমাদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। সকলে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

শুভার্থী
আনিসুজ্জামান

পুনশ্চ। স্বপনকে প্যাকেটটা পৌঁছে দিয়েছি।

সংস্কৃতির মিলন কখনো কখনো সমন্বয়সাধন করেছে বটে,

পাকাপোক্তভাবে ঢুকে গেছে, এসব তো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া উচিত–এই
পরিস্থিতিতে আমাদের সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তাটা কী হবে
আনিসুজ্জামান : আমার মনে হয়, শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই নয়
কোনো দেশেরই সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে কতকগুলো জাতীয় বৈশি
পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমাজের বিকাশ ক্ষেত্রের যে নানা উপাদান ?
যেভাবে ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয় করে বা মানুষের মনকে প্রভা , যে-
সেটা বুঝতে পারলে যায়, সমাধানের ইঙ্গিতটা ষ্ট্যের যে
এই বিশ্বাস থেকেই আমি সামাজিক ইতিহাসের কথা বার সেইগুলো
সামাজিক ইতিহাসে ষ্টশীলতা দেখার বান্বিত করে
কী পরিবেশের মধ্য দিয়ে করছে এবং সেই ও পাওয়া যায়।
তার মধ্যে পড়ছে আবার কাজটি পরিবেশ বার বলেছি এবং
করেছে। এখন আ জিক ইতিহা চেষ্টা করেছি। মানুষ
বছরের যে ইতিহাস এই সময়ে এ পরিবেশের কী প্রভাব
একটা রক্তক্ষয়ী যু ধ্য দিয়ে দশ কে কীভাবে প্রভাবান্বিত
আদর্শ স্থির করল স, বাংলাদেশের এই ৪৪
অনেক বড় একটা য় গেল এ স আমরা দেখি যে, এত বড়
বলেছি যে '৭৫ পরব যে বর্ত াধীন হলো, আমরা কতকগুলো
কোথাও দেখতে পাই না। কেউ ব এগোব, তিন-চার বছরের মধ্যেই
তারাই বলল যে তোমাদেরকে বং ন হলে ? আমি বারবার করেই
ধর্মনিরপেক্ষতা উঠিয়ে দাও। ত এইটা চ ল বলে আমরা
সাধারণ মানুষকে যখন ধর্ম লে াই। যারা শাসক
হয় বৈকি। বলা যেতে পা একটা রাষ্ট্রধর্ম দিল কেউ বলে নি যে,
দেওয়া হলো তখন তারা রাই বললেন নরপেক্ষ নই। এখন
হলো। কিন্তু নেওয়ার নিয়ে বোঝা তা কিছুটা অভিভূত
সাহস করে আগে রে, তাদেরকে য় ক র একটা উপহার
করছেন তাঁদের সেটা দু'হাতে ধর র একটা ব্যাপার
বলেছি একটা পরে দেখা যাচ্ছে যে াজ তিক নেতা তাঁরা
ধর্মীয় পরিচ র জায়গায় ফিরে তে পা ছেন না তাঁরা খুবই চিন্তা
আমরা দা একটা ধর্মীয় মুখ সবার ত। এটাকে আমি
না। অ অনগ্রসর চেষ্টা। কারণ পাকিস্তান-সৃষ্টির পরে মানুষের মধ্যে
সেটা য় নিয়ে একধরনের, বলা যেতে পারে উন্মত্ততা ছিল, কিন্তু শিগ্রিই
ফি বি জানালাম, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই, আমরা ধর্মীয় রাষ্ট্র চাই
র আমরা এত বড় একটা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তন আনলাম
কে ধরে রাখতে পারছি না। সেখানে ফিরে যেতে পারছি না বা সেখানে
রে যেতে ভয় পাচ্ছি যে লোকে কী বলবে। এটা আমাদের একটা
রাজনৈতিক ব্যর্থতা।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সূচনা করেছে বিরোধের।

আহমদ কবির

বিদ্বান আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশের বিদ্যার জগতে আনিসুজ্জামান দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন মূলত, কিন্তু মধ্য জীবন থেকে তিনি হয়ে ওঠেন জনপ্রিয় সামাজিক মানুষ, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে। মধ্যশ্রেণির যে-অংশটি লেখাপড়া ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত, আনিসুজ্জামান তাদের কাছে স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে রয়েছিলেন। সাতচল্লিশে ভারতবিভাগের পর থেকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে

অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে যেসব আন্দোলন হয়েছিল, যেমন বাহান্নোর বাংলাভাষা আন্দোলন, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির লড়াই, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বাংলা ভাষা সংস্কারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে অবস্থান, রেডিয়ো-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে আনিসুজ্জামানের কমবেশি যুক্ততা ও সক্রিয়তা ছিল। বাংলাভাষা-আন্দোলনের সময় আনিসুজ্জামান ছিলেন কলেজের ছাত্র; পরের সব সংক্ষোভের সময় তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পরে শিক্ষক। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্তরানুক্রমে বুদ্ধিজীবী শিক্ষক আনিসুজ্জামান গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও বিবেচনার জন্য। একাত্তরের স্মরণীয় মুক্তিযোদ্ধা তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে তাঁর ভাবমূর্তি আরও বিস্তৃত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংবিধান, সংলাপ ইত্যাদি জাতীয় দায়িত্বে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন এবং আমৃত্যু তিনি এ-সব ক্ষেত্রে বরণীয় ছিলেন।

আনিসুজ্জামানের বিকাশপর্বের ও কর্মজীবনের ভিত্তিস্থল হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, যদিও প্রায় ষোলো বছর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর কর্মসময়ের মধ্য পর্যায়ে। শিক্ষকতার প্রাথমিক দশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে ষোলো বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরের পঁয়ত্রিশ বছর পুরোনো কর্মস্থলে, যেখানে তিনি নিয়মিত চাকরির অবসানে হয়েছিলেন সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, এমেরিটাস অধ্যাপক এবং আমৃত্যু জাতীয় অধ্যাপক। জাতীয় অধ্যাপক হয়েও তিনি বাংলা বিভাগের কক্ষটিকে ব্যবহার করতেন আগের

মতোই, বিদ্যার্থীরা ও সাক্ষাৎপ্রার্থীরা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। টেলিফোনে টেলিফোনে মোবাইলে সয়লাপ, জন সমাগম প্রচুর। এই কক্ষ তাঁর সক্রিয় জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করেছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তিনি অনন্য-চিত্ত হয়ে বাংলা পড়ার বাসনা ব্যক্ত করলেন এবং তাঁরই আদি বাসস্থান চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের মহাপণ্ডিত ডক্টর শহীদুল্লাহর পরামর্শে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হলেন, ১৯৫৩-তে। শহীদুল্লাহ তখন বাংলা বিভাগের প্রধান। ভারত-বিভাগের পরে অনেক শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলে বিভাগ একপ্রকার শিক্ষকশূন্য হয়ে যায়, তখন অবসরপ্রাপ্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বাংলা বিভাগ গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মুহম্মদ আবদুল হাই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ধ্বনি বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা সমাপ্ত করে বাংলা বিভাগে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে আসেন। মুহম্মদ আবদুল হাই-ই সাতচল্লিশোত্তর বাংলা বিভাগের পিতৃপুরুষ। আনিসুজ্জামান তাঁর প্রিয়তম ছাত্র। এই ছাত্র অনার্স (১৯৫৬) ও এম এ (১৯৫৭) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে আবদুল হাইয়ের নির্দেশে গবেষণায় ব্রতী হলেন। বিষয়ও ঠিক করে দিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই—ইংরেজ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) বাঙালি মুসলমান লেখকদের রচনায় প্রতিফলিত চিন্তা। চমৎকার গবেষণা করলেন আনিসুজ্জামান এবং পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন ১৯৬২-তে। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার কথা বিবেচনা করলে বিষয়টির তাৎপর্য অসাধারণ। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যশ্রেণি ইংরেজি শিক্ষালাভ করে

যে নতুন কৃষ্টি লাভ করেছিল উনিশ শতকে এবং ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট হয়েও শিক্ষাবিস্তারে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে, বিশেষভাবে বাঙালির ভাষা বাংলায় যে সৃষ্টিশীল ও মননশীল সাহিত্য রচনা করে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল তা অভূতপূর্ব বটে, কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা এটিই ছিল আত্মসত্তা অর্পণের মূল প্রেরণা। তুলনায় বাঙালি মুসলমান ছিল অনেক পিছিয়ে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রধান স্বাপ্নিক আবুল হুসেনের হিসেবে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের ব্যবধান একশো বছরের বেশি। এই অবস্থায় ইংরেজ আমলে শিক্ষা ও বৃত্তিগত স্তরে মুসলমানদের ঠাঁই হতে বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরাও বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন লিখে এবং পত্রিকা সম্পাদনা করে। সুতরাং বিষয়-গৌরবে ঋদ্ধ আনিসুজ্জামানের গবেষণা মূল্য পেয়েছিল তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিন্যাসে। এই গবেষণার জন্য তিনি যখন ডিগ্রি লাভ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। গবেষণা কালেই আনিসুজ্জামান বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পান (১৯৫৯)। মুহম্মদ আবদুল হাই যাঁদের নিয়ে বাংলা বিভাগ ধীরে-ধীরে গড়ে তুলছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বনামধন্য গবেষক ও শিক্ষকেরা ছিলেন, যেমন মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিম এবং আনিসুজ্জামানের সমসাময়িক রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ওয়াকিল আহমদ, আনোয়ার পাশা প্রমুখ। তবে আনিসুজ্জামানের খ্যাতি তাঁর সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে গয়েছিল। পিএইচডি করার পরে

আমেরিকার শিকাগোতে গিয়েছিলেন তিনি এবং ইয়ংবেঙ্গলদের নিয়ে কাজ করেছিলেন। আনিসুজ্জামানের গবেষণা *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* নামে প্রকাশ পায় এবং পুরস্কৃত হয়। এই গবেষণার উপজাত হিসেবে তিনি মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকার এক বৃহৎ তালিকা প্রণয়ন করেন যা পরে *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র* নামে গ্রন্থরূপ পায়। এইসব গবেষণা কর্মের সঙ্গে তিনি মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত বিভাগীয় গবেষণা-পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকা'র সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন এবং পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বিভাগের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে জাতীয় জীবনের নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঢেউ আসে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকার বুকেরই মধ্যে, সেজন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের সক্রিয়তা ও অংশগ্রহণ সবসময় থাকে এবং এসব ক্ষেত্রে বাংলা বিভাগের ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে। আনিসুজ্জামান ঢাকার সব প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তারুণ্যের সময় থেকে তিনি বামপন্থায় প্রীতি পান। তরুণ সমাজকর্মীদের জন্য তিনি বিদ্যা জগতের একজন নির্ভরশীল মানুষ হয়ে ওঠেন। উনিশ-শো একষট্টিতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে উদ্যোগী ও অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের তিনি একজন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে তিনি সেসময়ে বাংলাদেশের রবীন্দ্রানুরাগীদের লেখার একটি সংকলন প্রকাশ করেন *রবীন্দ্রনাথ* শিরোনামে। এটিই পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রথম সংকলন। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত বর্ষ উদ্‌যাপনের সময় আগের সংকলনের লেখকদের মধ্যে অনেকেই বেঁচে ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন এবং

ছিলেন তাঁর সমবয়সিদের মধ্যে আরও কেউ-কেউ। সার্ধশত বর্ষ উদ্‌যাপনেও তিনিই হন মুখ্য। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কর্মসূচিতে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারিভাবে তাঁকে প্রধান ভূমিকা নিতে হয়। এবারেও সংকলন বের হয়। শান্তিনিকেতনেও।

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত বর্ষ উদ্‌যাপনের কালে তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর। পঞ্চাশ বছরে আগের এবং তার পরের বছরগুলিতে আনিসুজ্জামান প্রতিশ্রুতি-উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু যে-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রধান কর্মভূমি ছিল সেখান থেকে তিনি তখন সরে গেছেন অন্যত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে দূরে বটে, কিন্তু চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রও। ইংরেজ আমলে এখানে উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল। এবার এখান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাও হল। পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে আনিসুজ্জামান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অগ্রজ শিক্ষকসহ সপরিবার প্রথমে আগরতলা পরে কলকাতায় চলে যান এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারে যোগ দেন। কলকাতার সঙ্গে আনিসুজ্জামানের সংযোগ আগে থেকেই ছিল, এবার বাংলাদেশের হয়ে কাজ করার সুবাদে কলকাতার এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আরও নিকটে এলেন তিনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সাহায্য অনস্বীকার্য। এ সময়ের বৃত্তান্ত আনিসুজ্জামানের *আমার একাত্তর* ও অন্য গ্রন্থাদিতে আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আনিসুজ্জামান স্বদেশে ফিরে এলেন, কিন্তু সরকারি কোনো দায়িত্ব না-নিয়ে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জগতেই রয়ে গেলেন। নতুন দেশের শিক্ষা কমিশনে তাঁর দায়িত্ব পড়ল, বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধান বাংলায় অনুবাদ করার গুরুতর কাজও। শিক্ষকতার জগতে থেকেই তিনি এসব কাজ করছিলেন। তাঁর শিক্ষক একাত্তরের শহীদ মুনীর চৌধুরীর উপরে বক্তৃতা দিলেন, পরে সেটি গ্রন্থে রূপ নেয়। এরপর কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলোশিপ পেয়ে লন্ডন যান এবং আঠার শতকের বাংলা গদ্য নিয়ে গবেষণা করেন। আঠার শতকের গদ্য নিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। আর আছে *ফ্যাক্টরি করেসপন্ডেন্স* নামের বই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-পূর্ব বাংলা গদ্য নিয়ে পূর্বসূরিরা অনেকে কাজ করেছেন। আনিসুজ্জামান লন্ডনের জাদুঘর ও গ্রন্থাগার ঘেঁটে যেসব নতুন উপাত্ত পান সেগুলি আঠারো শতকের বাংলা গদ্যের নতুন নিদর্শন।

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য আনিসুজ্জামানকে পৃথিবীর অনেক জায়গায় যেতে হয়েছিল এবং বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। এইসব বক্তৃতা তাঁর ইংরেজি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এসব বক্তৃতার কিছু-কিছু তিনি নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলি হয়েছিল একেবারে মৌলিক রচনার মতো। সেরকম একটি অনুবাদ-গ্রন্থ হল তাঁর বিখ্যাত *স্বরূপের সন্ধানে*। আকারে ছোটো, প্রকারে বৃহৎ গ্রন্থ। বাঙালি মুসলমানের আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানের কাজ, যে-কাজ তিনি বিশদ আকারে করেছেন তাঁর *মুসলিম মানস* গবেষণা-গ্রন্থে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনিসুজ্জামান প্রত্যাবর্তন করলেন ঢাকায় ১৯৮৫-তে। সেই থেকে অব্যাহতভাবে

আমৃত্যু ঢাকায়। এখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কাজে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। বাংলা বিভাগ, টেক্সট-বুক পর্ব, বাংলা একাডেমি, জাদুঘর, আইন-কোষ প্রণয়নের কাজ ইত্যাদি অনেক কিছুতে সংশ্লিষ্টতা। এর ফাঁকে-ফাঁকে বিদেশভ্রমণ, বিশেষ করে কলকাতায় যেখানে তিনি নানা মর্যাদায় ও পুরস্কারে বৃত হয়েছেন। বিশ্বভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমি এবং আরও নানা প্রতিষ্ঠানে, দিল্লিতেও। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সাহিত্য পুরস্কার কমিটির সদস্য ছিলেন। দু-বার আনন্দ পুরস্কার পান, প্রথমবার নরেন বিশ্বাসসহ, পরে তাঁর *বিপুলা পৃথিবী* স্মৃতিগ্রন্থের জন্য। এ গ্রন্থ তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পূর্ণ বৃত্তান্ত। আগে রচিত *কাল নিরবধি* তাঁর জন্মবৃত্তান্ত ও জীবন-বিকাশের ইতিবৃত্ত। *আমার একাত্তর*, *কাল নিরবধি*, *বিপুলা পৃথিবী* তিনখানি স্মৃতিকাহিনি উপভোগ্য স্বাদু গদ্যে রচিত।

আরও অনেক গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। তাঁর মানববাদী চিন্তা, অসাম্প্রদায়িক অবস্থান, ইহজাগতিকতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা ও গ্রন্থ রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য সম্পাদিত গ্রন্থ; তাঁর নিকটবর্তী দূরবর্তী যত শিক্ষক, লেখক, সংস্কৃতসেবী ও গুণীজন ছিলেন তাঁদের নিয়ে সম্পাদনা গ্রন্থ তাঁকেই করতে হয়েছিল। এটা তাঁর জনপ্রিয়তার বোঝাও বলা যায়। এগুলো তিনি অকাতরে বহন করেছেন। আরও অনেক কাজ করেছেন সামাজিক মানুষ হিসেবে। এগুলোর ফিরিস্তি হবে বিপুল।

বাংলাদেশের গদ্যশিল্পীদের তিনি একজন। তাঁর গদ্যে রসবোধ ও মনন একসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পণ্ডিতি গদ্যের মধ্যে

প্রাঞ্জলতা ও সুস্পষ্টতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর গদ্যকে এখানকার কেউ-কেউ সুকুমার সেনীয় বলতে চেয়েছেন। সেরকমই আদল হয়তো আছে। কিন্তু আনিসুজ্জামানের স্বাতন্ত্র্য তাঁর গদ্যে অবশ্যই রয়েছে। বেঁচে থাকলে আরও অনেক কাজ তিনি করতে পারতেন। কিন্তু যতখানি জীবন তিনি পেয়েছেন তা কম নয়। আর এ জীবন পূর্ণ ও সফল।

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ।

লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব বা সমন্বয়েরও কিছু আভাস মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আছে। *সত্যপীরের পুঁথি* তার নমুনা। মধ্যযুগীর আদর্শে লেখা অথচ মিশ্র ভাষারীতির নয়, এমন আরেকটি কাব্য *গাজী কালু ও চম্পাবতী*তে হিন্দু-মুসলমানের আপাতবিরোধের অন্তরালে দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ মিলনের পরিচয় পাই। এই ভাবধারার পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটেছে বাউল গানে। যেকালে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখার আন্দোলন চলছিল, সেকালে এই সমন্বয়পন্থি ... অস্তিত্ব আমাদের একটি প্রবণতার পরিচয় দেয়।

বটতলার ছাপাখ... প্রকাশিত দু-একটি বইতে বাস্তব জীব... বে প্রায়-অশিক্ষিত লেখকদের হাতে ... প্রকাশের মাধ্যমে বাস্তবতা সম্প... লের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির ...

> সব সংস্কৃতিতেই স্থানকালের ছাপ যেমন থাকে, তেমনি তা বহন করে সর্বজনীনতার বীজ।

১৮৭০ ... নের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির ... দালনের প্রভাব সাধারণভাবে এ... ক হয়তো এই আদর্শের অনুসারী ... র প্রভাব অনেকটা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ... করা যায়, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান এবং শ... র আলিগড় আন্দোলনের মনোভাব বাঙালি মুসলমান লেখকদের ... য়েছিল।

এর মূলে রয়েছে মুসলমান হিসেবে লেখকের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং—সঙ্গে-সঙ্গে—গৌরববোধ। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আমরা যা লক্ষ করেছি, অর্থাৎ ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব বা সামাজিক অবস্থা স... সচেতন না হয়েও নিজের ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে এক ধরনের মুগ্ধতা, ... র একটা অন্ধ গৌরব—আধুনিককালের অধিকাংশ লেখকের মধ্যে ... কটু উন্নত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মের নির্দেশ লেখকের ব্যক্তিগ... দের আচরিত কিংবা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতখানি ত্রুটিমুক্ত ... র্কের বিষয় হতে পারে। তবু নিজেকে মুসলমান বল... করা যা কিছু মুসলমানের নিজস্ব ব্যাপার ... এইজন্যে এঁদের রচনায় ই... লামের না... ীতের, কখনো তুর... তনোন্মুখ ... প্রকাশ হয়েছে ... াইতে অতীতের ... ধারার পরিচয় দে...

রাজ... কামনা

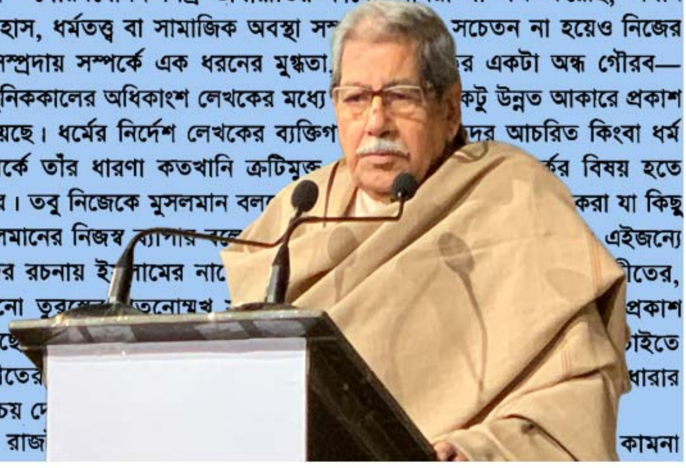

ম হী বু ল   আ জি জ

আনিসুজ্জামান এবং একটি ধ্রুপদি গ্রন্থ

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে সব কিছুরই পূর্বাবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থায় রূপান্তর ঘটেছে। সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থানের পরম্পরা নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বত্রই একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। একটি প্রচলিত ধারণা এই যে প্রাচীন যুগে নারী যাকে ঠিক ঋজু অবস্থান বলে সেখানটায় স্থিত ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে অব্যবহিত যে-প্রশ্ন জাগে—নারীর কি তাহলে যোগ্যতার অভাব ছিল। নাকি সেখানে নিহিত অন্য কার্যকারণাদি। এমন যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা সেখানে মাত্র কিছুকাল আগেও

ছিল না নারীর ভোটাধিকার। উনিশ শতকের মধ্যভাগে জন স্টুয়ার্ট মিল এবং তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা মিলকে প্রচুর লেখালেখি করতে হয় সমাজে নারীর অধিকারের প্রশ্নে। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা চলে। বস্তুত একটা প্রবল পুরুষাচারের বিপরীতে সংগ্রাম করেই তবে নারীকে তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাতে হয়। যে-পুরুষাচারের কথা বলা হল সেটির উদ্ভব ও আবর্তন ঘটেছিল ক্রমান্বয়ে এবং তার সূচনাবিন্দু আরও-আরও প্রাচীনতার মধ্যে নিহিত। দক্ষিণ আফ্রিকার নৃবিজ্ঞানী রবিন ফক্স কিংবা লায়োনেল টাইগারের রচনা থেকে দেখা যাবে, নারীর পিছিয়ে থাকা এবং পুরুষের করুণার লক্ষ্য হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হয়েছিল সেই আদিম সাম্যবাদের যুগেই, যখন ঘরের পুরুষ শিশুরা শিকারের উদ্দেশ্যে শস্ত্রপাণি হয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের পিছু-পিছু বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়েছিল আর সন্তানসম্ভবা ও পরবর্তীতে অরক্ষিত সন্তানের প্রযত্ন সাধনে নারীকে থেকে যেতে হয়েছিল ঘরে। ঘরে-থাকা নারীর সেবায় ঘরে থেকে গিয়েছিল নারী শিশুরাই, পুরুষ শিশুরা নয়। রবিন ফক্স তাঁর বিখ্যাত 'মেল-মেল বন্ড' তত্ত্বে একথা ব্যক্ত করেছেন। কাজেই নারীর সামাজিক অবস্থানের হেতুর সূচনা সুপ্রাচীন কালেই। পরবর্তীতে সামাজিক পুরুষ নারীর সেই অবস্থানের সুযোগে নারীকে আরও কোণঠাসা ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থানে নিয়ে গেছে। কিন্তু নারীর নিজস্ব যোগ্যতার কোনো ঘাটতি কখনই ছিল না। বরং যে-নারী পৃথিবীর তাবৎ জনগোষ্ঠীর জন্মদাত্রী তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে খাটো করে দেখবার কোনো উপায় থাকে না।

সুমেরীয় সভ্যতায় নারীকে দেখা যায় যোদ্ধার ভূমিকায়, সিংহ তার বাহন। বাহনের এমন শক্তিমানতা থেকে সেখানকার নারীর অবস্থানটিকে বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় পুরাণেও নারীকে পাওয়া যাচ্ছে যোদ্ধার চরিত্রে। সুমেরিয়ায় নারী ছিল বিশাল পার্বত্য সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী এবং ছিল ভারতবর্ষেও। আবার এর বিপরীতে সুমেরিয়ায় নারীকে নিয়োজিত হতে হত ধর্মীয় গণিকাবৃত্তিতে। ঠিক একই চিত্র মেলে ভারতবর্ষেও। 'গুপ্তসংহিতা'য় নারী প্রয়োজনে পতিকে ত্যাগ করতে বাধ্য ছিল— "কুলমহিম বিনা দেবী যো/যপেত স তু পামর"। এমন বহু প্রতীপ-বিপ্রতীপ চিত্র নারী প্রসঙ্গে সব পুরাণেই লক্ষ করা যাবে। উপনিষদে পাই, গার্গী বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে প্রবল যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে। তবে নারী একটা জিনিসই করতে পারেনি—পৌরহিত্য। মাতৃতান্ত্রিকতার সচলায়তনের মধ্যেও নারী সেই অধিকার থেকে দূরেই থেকে যায়। ধারণা করা যায়, সেটা হয়তো নারীর সন্তান ধারণের ও প্রতিপালনের দীর্ঘকালীন প্রাকৃতিক নিয়মের কারণেই ঘটেছিল। যদিও আড়াই হাজার বছর আগেকার দৃষ্টান্তে দেখা যায় জৈমিনি নারীর যজ্ঞ পরিচালনা করবার পক্ষে মত দিচ্ছেন। আর শাস্ত্রজ্ঞানে নারীও যে কম যোগ্য নয় তার প্রমাণ তো মহাভারতের কুন্তী-ই।

আনিসুজ্জামান রচিত *বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে* গ্রন্থ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত পটভূমিটি মনে রাখলে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় নারীর সামগ্রিক অবস্থানটিকে বুঝতে সুবিধে হয়। আড়াই হাজার বছর আগে এ্যারিস্টটল সাহিত্যকে সমাজের অনুকরণ বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। সে-হিসেবে বাঙালি রচিত গ্রন্থাদির

আনিসুজ্জামানকৃত বিশ্লেষণ এক অর্থে বাঙালির পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক এমনকি রাষ্ট্রনীতিক বিশ্লেষণও বটে। আর সে-বিশ্লেষণে নারী রয়েছে কেন্দ্রীয় জায়গায়। অর্থাৎ সাহিত্যে চিত্রিত নারীর ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক অবস্থানটি কেবল কল্পনানির্ভর সাহিত্যকর্মের ফল নয় তা বাস্তবতারও প্রতিরূপ। প্রাচীন-মধ্য এবং আধুনিক এমন পর্ব-পরম্পরায় বাঙালি নারীর ধারাবাহিক একটি রূপ আমরা খুঁজে পাব গ্রন্থটিতে। গ্রন্থকারের মূল অবলম্বনও গ্রন্থই, আর সে-কাজে সহায়তা যোগায় ইতিহাসের নানা সূত্র। আনিসুজ্জামানের সাহিত্য-গবেষণার একটি বড়ো গুণ হচ্ছে, সাহিত্যকে ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের আলোকে আলোকিত করে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো। সেটা কতটা সত্য সে-প্রশ্ন না-তুলেই বলা যেতে পারে, সত্যানুসন্ধান প্রকৃত গবেষকের ধর্ম। সেই সত্য যতটা না গবেষকের তারও অধিক মূল রচয়িতাদের। আর সেইসব রচয়িতা যদি হন অজস্র ও বহুস্বর তাহলে সেই বহুবাচনিকতা থেকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান হয়ে পড়ে দুরূহ। আনিসুজ্জামান সেই দুরূহ পথের পথিক। ইতঃপূর্বে তাঁর রচিত *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* কিংবা *স্বরূপের সন্ধানে* গ্রন্থ দু-টিকে বর্তমান গ্রন্থের পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাহলে তাঁর *বাঙালি নারী* গ্রন্থটি তাঁর ত্রয়ী পর্বের শেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

যে-অজস্র আর বহুস্বর উপস্থিতির কথা বলা গেল সেটা গ্রন্থে ব্যবহৃত সূত্রসমূহ লক্ষ করলে স্পষ্ট হয়। নিজের সিদ্ধান্তকে যাচাই করবার বেলায় গবেষক কখনই একক কোনো উৎসের ওপর

নির্ভর করেন না। বস্তুত সমাজ কিংবা সংস্কৃতি যেটাই বলি-না কেন তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করবার ক্ষেত্রে সমষ্টির প্রতিক্রিয়ার অভিমুখেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। আবার, সেই সমষ্টিকে উপলব্ধি করবার জন্যে ব্যক্তিক কোণেরও প্রয়োজন। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদের বিষয়টিকেও রাখতে হয় বিবেচনায়। প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের এমন অনেক বিষয়ের কথা বলা চলে যেখানে সূত্র অপ্রতুল হলেও তা থেকেই পৌঁছাতে হয় সামাজিকতার মতো সমষ্টিগত প্রসঙ্গের বিচারে। চর্যাপদের একটি চর্যায় শুঁড়িখানায় নারীর মদ তৈরির দৃষ্টান্ত থেকে একটি বিশেষ ধরনের নারী-শ্রমিক শ্রেণির কল্পনা করা যায়। আনিসুজ্জামান তাঁর গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল কর্মের প্রায় সব শাখায় অন্বেষণ চালিয়েছেন করেছেন নারীর অবস্থান নির্ণয় করবার জন্যে। এতে একটা বড়ো সুবিধে হল এইসব সমকালীন দৃষ্টান্ত কখনও-কখনও গড়ে ওঠা প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে কিংবা সে-বিষয়ে নতুন ভাবনার সুযোগ এনে দেয়। ধরা যাক, পুত্র ও কন্যাসন্তানের মধ্যে পার্থক্য করবার প্রচলিত রীতিটির কথা। আনিসুজ্জামান তাঁর গবেষণায় 'মনসাবিজয়' থেকে 'চণ্ডীমঙ্গল' 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' হয়ে 'ধর্মমঙ্গল' পর্যন্ত এই তিন শত বছরের পটভূমিকায় দেখান যে সেই প্রচলনের ব্যত্যয় সুস্পষ্ট বরং সমাজ নারীর আগমনকে বরণ করে নিচ্ছে সাদরে। এমনকি মহাকবি আলাওলের কাব্যের নায়িকা পদ্মাবতীর জন্ম হলে তার প্রতিক্রিয়ায় আনন্দোৎসব চলে টানা সাত দিন।

এরকম উৎসাহব্যঞ্জক এবং চমকপ্রদ সব সংবাদের ফলে জ্ঞানের এক নবতর আকরের সন্ধান আমরা পাই যেখানে

অনেক কিছুই পুনর্মূল্যায়নের মুখোমুখি। সেরকমই একটি অনুষঙ্গ নারীশিক্ষা। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ এই তিন শতাব্দীর সমন্বিত কালপরিধিকে কোনোভাবেই স্বল্প বলা যাবে না। 'লায়লী মজনু', 'নবীবংশ', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', 'গোপীচন্দ্রের গান' 'কৃষ্ণগণেশোদ্দীপিকা', 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে শিক্ষিত নারীদের উপস্থিতি নিশ্চয়ই কোনো সমাপতনের ফল নয় সেটা সামাজিক বাস্তবেরই আপতন। একই সমান্তরালে ছিল মুঘল শাসনের নিয়ন্ত্রণ। সেন-সুলতানি আমলে বাংলায় যে ইসলামের বিস্তার ঘটে তা মূলত মারফতি ঘরানার বলেই আমরা বাংলায় সুলতানি আমলের মতো একটা সাংস্কৃতিক আবহের যুগ পেয়েছিলাম যেখানে শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি ছিল বিশেষ দৃষ্টি—শাসকের এবং সেহেতু প্রজাবর্গেরও। লক্ষ করবার বিষয়, সুখময় মুখোপাধ্যায় এ-যুগকে যে স্বাধীন যুগ বলে অভিহিত করেন সে-স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিকই নয়, ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিকও। শিক্ষা সেখানে পালন করে একটা বিশেষ অনুঘটকের চরিত্র। অনুবাদ-সাহিত্যের ব্যাপ্ত বৃত্তটিকে স্মরণ রাখলে আমরা দেখবো চট্টগ্রামের মতো সুদূর প্রান্তাঞ্চলেও (শাসকের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে) মহাভারতের মতো বিশাল সাহিত্যকেন্দ্রিক তৎপরতা চলছে। বস্তুত এই ধারাটি মুঘল আমলে সেভাবে পৃষ্ঠপোষিত হয়নি। মুঘলরা আসে মারফতি ইসলামের বিপরীতে শরাফতি ইসলামের ঝান্ডা হাতে নিয়ে। বাংলায় মুঘলদের পরিবর্তে সুলতানদের শাসন অব্যাহত থাকলে কী হত সেটা হয়তো অতি-বাদমূলক কল্পনা কিন্তু সেটা যে অন্তত শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণাদায়ী হত তা বলা বাহুল্য।

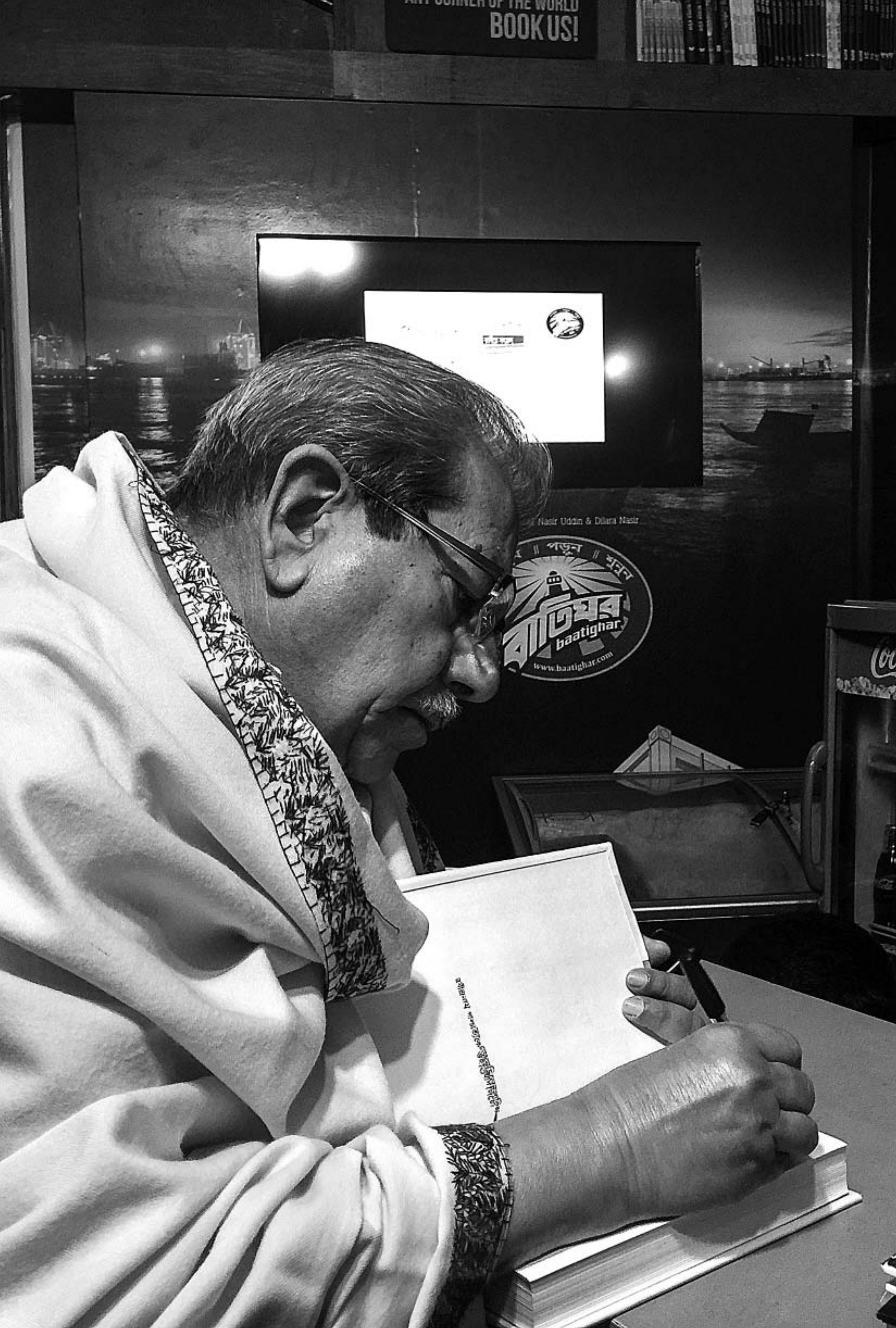

BOOK US!
বাতিঘর
baatighar
www.baatighar.com

মুঘল শাসনামলেই বিকশিত হয় বেদনা ও পরাধীনতাবোধের কাব্য মঙ্গলকাব্য। বিদেশি শাসনকবলিত বাংলার কবিগণ অলৌকিকতার (দেব-দেবীনির্ভরতা) হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করে-ছিলেন তাঁদের সৃজন-কল্পনায়। তবে মঙ্গলকাব্যে বাংলার পারিবারিক-সামাজিক চিত্রের ব্যাপক প্রতিফলন এ-কাব্যধারার একটি বিশেষ দিক। সংখ্যায় প্রচুর মঙ্গলকাব্যে পারিবারিক ও সামাজিক নারীর অভাববেদনার চিত্র যতটা মেলে তার শিক্ষার চিত্র ততটা মেলে না। এ-সময়কার বাংলার নারী বাংলা-মৃত্তিকার মতোই সর্বংসহা। পাশাপাশি নারীর সূত্রে আন্তর্মানবিক সম্পর্কেরও অনেকখানি ছবি থাকে। পরিবারে-সমাজে বিভিন্ন ভূমিকায় নিয়োজিত নারীর নানা চিত্র মধ্যযুগের সাহিত্যকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। তার দাম্পত্য জীবন কিংবা তার দাম্পত্য-অতিরেক সম্পর্ক-বিস্তৃতিও সাহিত্যের কৌতূহলোদ্দীপক দিক। "বিবাহসম্পর্কের বাইরের নরনারীর প্রণয় ও মিলন তাই অজ্ঞাত ছিল না"—আনিসুজ্জামানের এমন মূল্যায়ন শুধু নারীর নয় পুরুষের অবস্থান বুঝবার পক্ষেও সহায়ক হয়। অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে পরকীয়া কিংবা পরনারীর আকর্ষণ পরিত্যাজ্য বলে প্রচার করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী-পুরুষের অনিয়মঘটিত সম্পর্কের কাহিনি মধ্যযুগের কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে লিখিত হয়েছিল। সাহিত্য থেকে নেওয়া গবেষকের দৃষ্টান্তসমূহ বিষয়টিকে যুক্তির নিরিখে ভাবতে সহায়তা করে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত সাহিত্যে বিধৃতির সূত্রে পরকীয়ায় নারীকেই মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। চর্যায় নারীর গভীর রাতে গৃহত্যাগ কিংবা পদাবলির রাধার বিচিত্র অভিসার সে-ধারণাকে বদ্ধমূল করে।

কিন্তু 'মনসাবিজয়' কাব্যে চাঁদ নিজের স্ত্রীর সামনেই অন্য নারীর প্রতি আসক্তির ভাব প্রকাশ করে অনায়াসে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কথা বলা যায় যেখানে 'কাহার ষোড়শী কন্যা আন্যাছ ঘরে' বলে হাহাকার করে ফুল্লরা। মধ্যযুগেই, গবেষক আমাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান, দাসী-ক্রীতদাসী প্রভৃতি ভোগের ব্যাপারে গৃহবাসী কিংবা সৈন্যদল কেউই পিছিয়ে ছিল না। কাজেই কেবল নারী নয় পুরুষের দায়কেও আর অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

মনোবিজ্ঞানী থিয়ডোর রাইক (বিখ্যাত *ম্যাসোকিজম লিসেনিং উইথ দ্য থার্ড ইয়ার* প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা) ছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের প্রথম দিককার ছাত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানবসত্তার বিশ্লেষণে মনোবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১০-এ তাঁরই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেন, পুরাণ এবং সাহিত্য ও ধর্মের ইতিহাস-বিবরণী হতে পারে সেই বিশ্লেষণের পক্ষে সবচাইতে প্রয়োজনীয় সহায়ক-সূত্র। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, সামাজিক সত্যের অন্বেষণে ইতিহাস এবং সাহিত্যের দ্বন্দ্ব সুপ্রাচীন। ইতিহাস যতই অকাট্য হোক তাকেও অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগের ইংল্যান্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে খোদ ঐতিহাসিকেরাই মেনে নেন সাহিত্যের সহযোগ। মিস গ্যাস্কেলের *মেরি বার্টন*, বেঞ্জামিন ডিজরায়েলির *সিবিল* কিংবা চার্লস্ কিংসলের *এ্যাল্টন লক* ইত্যাদি উপন্যাস আজও ইতিহাসের সহায়তাকারী। লক্ষ করতে হয়, পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়া ডিজরায়েলি তাঁর উপন্যাসের সম্পূর্ণ নামকরণ করেছিলেন *সিবিল অর দ্য টু নেশন্স*।

যে-তিনজন রচয়িতার উল্লেখ করা গেল তাঁদের সকলের রচনার সমন্বয় করলে যা দাঁড়ায় তা হলো যৌথ অবচেতনা। একেকটা যুগের সাহিত্যে এই যৌথ অবচেতনার সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ। এর আবার থাকে দু-টো দিক—একটা সমাজবদ্ধ মানুষের যৌথতা এবং অন্যটা রচয়িতাদের যৌথতা। এই দুই যৌথতার মেলবন্ধনকে যাচাই করেন ঐতিহাসিক। আনিসুজ্জামানের নারীচিত্রণে যৌথ অবচেতনার ভূমিকা অনেকখানি। নারীর যে-সামাজিক অবমূল্যায়ন মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতক পর্যন্ত সমাজ-সত্তার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় তা পরবর্তীতে ঔপনিবেশিকতার আয়তনে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রবাহে ভিন্ন খাতের অভিমুখী। নারী যে কেবল নারী (আধুনিক দৃষ্টিতে যা এক ধরনের 'অপর') হওয়ার কারণেই অবমূল্যায়নের লক্ষ্যবস্তু তার প্রভূত উদাহরণ সাহিত্যে রয়েছে। এটিও অনস্বীকার্য, যে-সূত্রগুলো গবেষক আনিসুজ্জামানের অবলম্বন সেসব ইতিহাসের চাইতে অনেক বেশি দামি ও প্রয়োজনীয়। পতিপ্রেম, সহমরণ, অন্তর্জলি, বৈধব্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, উপপত্নীত্ব ইত্যাকার যত অনুষঙ্গের কথাই বলা হোক-না কেন সব ক্ষেত্রেই নারীকে হতে হয় নিয়ন্ত্রণ, শোষণ, ব্যভিচার কিংবা নির্যাতনের শিকার। এমনকি ঔপনিবেশিক যুগের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রসারতার যুগের অনেকটা কাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও নারীর প্রতি প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই থেকে যায়। 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', 'লালমতি-সয়ফুলমুলুক', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর', 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী', 'মনসাবিজয়', 'অন্নদামঙ্গল', 'সোনাভান' প্রভৃতি কাব্য সময়ের এবং তথা ইতিহাসেরই নীরব

সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। আজ থেকে তিন শত বছর আগেকার কবি আবদুল হাকিমের কাব্যে (‘লালমতি-সয়ফুলমুলুক’) যখন বলা হয়—“নারীর অঙ্গ পুরুষের বিহারের স্থল।/ পুরুষ ভ্রমর হয় নারী যে কমল” তা আরও স্পষ্টতা পায় আরও এক শত বছর পরে নসরুল্লাহ খোন্দকারের বদৌলতে (‘শরীয়তনামা কাব্যে’)—“নারীরে সৃজিয়া প্রভু পুরুষরে দিল।/ পশূর উপরে যেন রক্ষক করিল”—যৌথ অবচেতনার যে-রূপ গবেষকের সাহিত্য-বিশ্লেষণে আমরা পাই সে-সূত্রে বলা যায় ভাব-ভাষা-আঙ্গিক পালটে দিলে এমন প্রকাশ আজকের দিনেও সুলভ। এখানেই সাহিত্যকর্ম ধরে রাখে ইতিহাসের ক্রমটিকে। আনিসুজ্জামানের সাহিত্য-বিশ্লেষণে ইতিহাস এবং সমাজ এমনই প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে।

আঠারো-উনিশ শতকে বাংলায় সংঘটিত রেনেসাঁসের কার্যকারণ হিসেবে শিক্ষা ছিল একটা বড়ো অনুঘটক। অনেকেই রেনেসাঁসের জন্যে সরাসরি ঔপনিবেশিক মানুষদের উদ্যোগ ও প্রভাবকে মূল প্রেরণা রূপে মনে করলেও আনিসুজ্জামানের পর্যবেক্ষণটি পরখ করে দেখবার মতো। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব সত্ত্বেও প্রাচ্যের তথা স্থানীয় অবদানকেও কোনোভাবে খাটো বলে বিবেচনা করা অনুচিত। ‘প্রাচ্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের’ প্রতিবাদ চেতনার স্ফূরণ না-ঘটলে একা বিদেশিরা প্রচলিত প্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাতে সক্ষম হতো না। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বাঙালি নারীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে গবেষক এই দ্বান্দ্বিক পটভূমিটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই দ্বান্দ্বিকতার পেছনে ছিল দু-টি যুগের সংক্রান্তি এবং সংরক্ষণশীল

ও পরিবর্তনকামী এই দুই ভিন্নধর্মী মানসিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই যুগ ঘর ও বাইরের মধ্যে যোগাযোগের যুগ। পত্র-পত্রিকা, প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, চাকরি-বাকরি, দল-সংগঠন এসবের স্রোতময় ধারায় বিকশিত হতে থাকে বাংলার সমাজ ও পরিবার। পুরোনো কবিতার দিনও অপসৃত হতে থাকে। সামনে চলে আসে গদ্য-আখ্যায়িকা-উপন্যাসের যুগ। প্রতীক ও রূপকের পরিবর্তে সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তব দেখা দিতে বিভিন্ন রচনায়। আবার, সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কের সূত্রে সমাজ-মানসের অবয়বটি সরাসরি উপলব্ধি করবার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। কাজেই এমন উত্তলাবতল সময়ে নারী-পরিস্থিতি পূর্বেও চাইতে অনেক জটিল হয়ে পড়ে। সেই জটিলতায় শিক্ষা হয়ে দাঁড়াল সবচাইতে শক্তিশালী উপাদান।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। উনিশ শতকে কোম্পানির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হোক কিংবা হোক তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, মিশনারিরা যে-বিদ্যালয়গুলো চালু করে সেগুলোর পরিচালনার দায়িত্বে থাকে প্রভাবশালী বিদেশি মহিলারা। তাঁদের কেউ পদস্থ কর্মকর্তাদের স্ত্রী, কেউ-বা সৈন্যাধ্যক্ষের স্ত্রী, অথবা কেউ কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির স্ত্রী। অর্থাৎ ব্রিটিশ রমণীরা বাঙালি নারীদের সমব্যথী হয়ে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলবার চেষ্টা চালান। কেউ-কেউ এক বাইবেলে সমর্পিত মানসের পুণ্যার্জনের প্রচেষ্টা বলে মনে করেন। আবার, অনেকের ধারণা নারীদের (এবং পুরুষদেরও) শিক্ষিত করে তুলতে পারলে হয়তো তাদেরকে পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করবার কাজ ত্বরান্বিত হয়। পাশাপাশি থাকে

রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখের আঁধারবিরোধী যুদ্ধের তৎপরতা। ইয়ং বেঙ্গলের উন্মূল চরিত্র নিয়ে যতই ব্যঙ্গ করা হোক-না কেন প্রচলবিরোধী লড়াইয়ে তারাও ছিল সমান যোদ্ধা। উনিশ শতকের দ্বান্দ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের প্রবল ইহজাগতিকতার দিকটিকে সমকালীন পরিবর্তমানতার স্রোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রূপে চিহ্নিত করেন আনিসুজ্জামান। তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সমাজদৃষ্টিকে চালেঞ্জ করবার রামমোহন-বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে বিপুল অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে দেখা দেয় সমকালে ও প্রজন্মান্তরে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মশারফ, মেহেরুল্লাহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ হয়ে আমরা উনিশ-বিশ শতকের দুই যুগের পৃথক-পৃথক ও পারস্পরিকতাযুক্ত চিত্রটি পাই। তখনকার সৃজনশীল সাহিত্য বিশেষত গদ্য উপন্যাস এবং নাটকে উপস্থাপিত উদাহরণগুলোর প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ আনিসুজ্জামানের নিবিড় শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় কিন্তু এসব ব্যতিরেকে যুগের সঠিক চেহারাটিকে অনুধাবণ করাও দুষ্করও বটে।

১৮৫২-তে প্রকাশিত হ্যানা ক্যাথারিন মলেন্সের *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* উপাখ্যানে গ্রাম্য রমণীদের সঙ্গে ফুলমণি যে কথোপকথন চালায় তা-তে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষামুখী মেয়েদের বাড়ির পুরুষ লোকে পছন্দ করছে না। কেননা, শিক্ষিত হলে তারা যুক্তির অবতারণা করতে চায় এবং তারা তাদের অধিকার সম্পর্কেও প্রকাশ করে সচেতনতা। হ্যানার স্বামী জোসেফ মলেন্সের বই *টেন ইয়ারস্ মিশনারি লেবারস্ ইন ইন্ডিয়া*-তে রচয়িতার প্রবল আশাবাদ লক্ষ করা যায়। মিশনারি কাজের

মধ্য দিয়ে তাঁরা যে বাংলার অন্ধকার গ্রামগুলিকে আলোকিত করতে পারছেন সেটা হয়তো তাঁদের আত্মতৃপ্তির প্রকাশ কিন্তু তা সত্যেরও আভাস। কেননা, মিশনারিরা নানাভাবে বাংলার নারীমনে সাড়া তুলবার কাজ চালিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্যে কেবল শিক্ষাই নয়, অন্যান্য কর্মকাণ্ডেরও ব্যবস্থা রেখেছিল। সেলাই, এমব্রয়ডারি, উলের কাজ, ডিজাইন এইসব কাজ শিখিয়ে নারীদের মনে নতুন প্রণোদনাও জাগাবার চেষ্টা তারা করে। প্রয়োজনে ছিল টিফিন, দিনের আহার এমনকি আবাসিক সুবিধা-দানেরও ব্যবস্থাদি। একদিকে মিশনারি, পরবর্তীতে সরকারি নারীশিক্ষা পরিস্থিতিকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রভাবিত করতে থাকে। সেটা যে যথেষ্ট সামাজিক তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ সেই সময়কার শিক্ষিত মন-মানসিকতাধারী বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। শিক্ষিত হলেও অনেকে নারীর শিক্ষা এবং শিক্ষাসচেতনতাকে ইতিবাচকভাবে নেয়নি। বরং, নারী সম্পর্কে তাঁদের মানসিক পশ্চাদপদতার ছবিটাই ভেসে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ কবি যেমন তেমনি নিরেট গদ্যের শিল্পী বঙ্কিমও সমালোচনার পরশ-পাথরের নিরিখ থেকে মুক্তি পান না। তাই নারীর অবস্থানের বিশদ বৃত্তান্ত জানতে গেলে একদিক থেকে দেখতে হয় গবেষক-কথিত 'সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের প্রসঙ্গ' এবং অন্যদিকে নারীর শিক্ষিত হওয়ার ইতিহাস। ইতিহাস-সমাজসচেতন আনিসুজ্জামান তৎকালীন নারীর আত্মজীবনীকেও সফলভাবে ব্যবহার করেন তাঁর নারী-অবস্থান বর্ণনার ক্ষেত্রে। নারীর শিক্ষা কেবলমাত্র একমুখী মাত্রিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিবারে-

সমাজে-দাম্পত্যে সর্বত্র নারীর পরিবর্তমান অবস্থানের ছায়াপাত ঘটতে থাকে। নারী যে নিজেই তার এই নবজাগ্রত চেতনার কথা বলে তা নয়, গবেষক দেখান যে নারীর নিকটতম প্রতিবেশি পুরুষও নারীর এই বদলে যাওয়াটাকে ধরবার চেষ্টা করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখের রচনায় হয়তো শিক্ষিত বাঙালির নারীসচেতনতার একটা রূপ পাওয়া যায় কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা তাঁরা এতকাল নেপথ্যে-আড়ালে-পশ্চাতে পড়ে থাকা নারীকে বন্দনার যোগ্য বলে ভাবতে শুরু করেছেন। আনিসুজ্জামানের দৃষ্টিতে নারীবিষয়ক উনিশ শতকের এই বোধটি ছিল সম্পূর্ণ 'নতুন'।

আনিসুজ্জামানের *বাঙালি নারী* গ্রন্থটি আকারে ক্ষীণ, মাত্র ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার কিন্তু এটির কালগত পটভূমি প্রায় বারো শত বছর (চর্যাপদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত)। এত বিপুল কালের গ্রন্থিকে একটি ক্ষুদ্রায়তনে ধরবার কাজটি দুরূহ। আনিসুজ্জামান তাঁর স্মরণীয় মনস্বিতা দিয়ে সে-কাজ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর এই গ্রন্থ একদিন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একটি ধ্রুপদি গ্রন্থে পরিণত হবে, একথা বেশ আস্থার সঙ্গেই বলে দেওয়া যায়।

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ, দীপঙ্কর দাশ।

লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

জীবনের যা কিছু ভালো
তা যদি প্রত্যেক সাংস্কৃতিক
ক্রিয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে,
তাহলে বলতে হবে,
যেসব ক্ষেত্রে সংস্কৃতির উপাদান
মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধের
বিরোধী হয় এবং বর্ণবাদ,
জঙ্গিবাদ, কুসংস্কার
বা অনুরূপ নিন্দনীয় ভাব
আশ্রয় করে, সেখানে তো
সেই ঝুঁকির মাত্রা বেশি।

আখতার হোসেন খান

বাঙালির সংস্কৃতি: অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বক্তব্য নিয়ে কিছু কথা

সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি-সাধক বইটি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জা-মানের স্বচ্ছপ্রবাহ সৃষ্টিশীলতার নমুনা। বাংলা ভাষার ভারিক্কি পাঠকদের জন্য এ জাতীয় বই শধু অবশ্যপাঠ্যই নয়, দেশজ ভাষা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে যারা অংশ নিতে চান, তাঁরা অনেক অর্থবহ মাল-মশলা পাবেন এর প্রায় দু-শত পৃষ্ঠার আলোচনায়। বাংলা সংস্কৃতি কী, পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি কী সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে এসব কথা দিয়ে শুরু হয়ে দশজন সাহিত্যিক নিয়ে আলোচনা এবং শেষাংশে ছয় জন চিত্রশিল্পী-সম্পর্কিত কথা দিয়ে

শেষ হওয়া বইটি অনেক বইয়ের ভিড়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলে।

বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌সের এই বইটি বের হয়েছে ১৯৭৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা লেখকের একুশটি প্রবন্ধ নিয়ে। এর প্রথম তিনটি—'বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে', 'স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি', 'প্রাতিষ্ঠানিক উদ্‌যোগ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য'—এই আলোচনার কেন্দ্রে। অন্য প্রবন্ধগুলোর মধ্যে প্রথম অংশে উপরে বর্ণিত তিনটি-সহ আছে 'বাংলা ভাষায় আইনের আদি অনুবাদ' ও 'নারীর উচ্চশিক্ষা ও ক্ষমতায়ন', দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের নিয়ে। অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই; এরপরে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, জসীম উদ্‌দীন, অন্নদাশঙ্কর রায়, হুমায়ুন কবির, সুফিয়া কামাল, আবু রুশদ, কবীর চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও হুমায়ূন আহমেদ। একজন পাঠক যখন এই প্রবন্ধগুলোর মধ্য দিয়ে যাবেন (মোট দশটি), মনে হবে এমন উপাদেয় সব মহার্ঘ্য প্রায় কোনো পরিশ্রম না-করেই আয়ত্তে এল। তেমনি শিল্পীদের সম্বন্ধে ছয়টি প্রবন্ধেও (কামরুল হাসান, আমিনুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, মুর্তজা বশীর ও নিতুন কুণ্ডু) একইভাবে সব প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য সামনে আসে বিনা আয়াসে। আর এসবের বাহন, পুরো বইটিতে যার এক নিঃসংশয়-অপ্রতিহত পদচারণা, যা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের প্রধান অস্ত্র—তাঁর

বদরুদ্দীন উমর

নিশ্চেষ্ট গদ্যভঙ্গি—পক্ক, নিবিড়, সুখপাঠ্য ও সুস্বাদু। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছাড়া ঢাকায় এমন মজাদার গদ্য আর কে লেখেন?

লেখক চর্যাপদ, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, নূর বাঙালী, লালা বাঙালী, সৈয়দ সুলতান (আমার মতে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী) প্রমুখের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং পরিশেষে সুকুমার সেনকে উদ্ধৃত করে এই অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছেন যে: "বাংলা ভাষায় কথা বলাটাই বাঙালি পরিচয়ের মুখ্য উপাদান হয়ে রইল। যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের বাইরে যাঁরা আমাদের মতো, তাঁদের কাছে এসব মনে-করিয়ে দেয়া নিঃসন্দেহে ভালো লাগবে।"

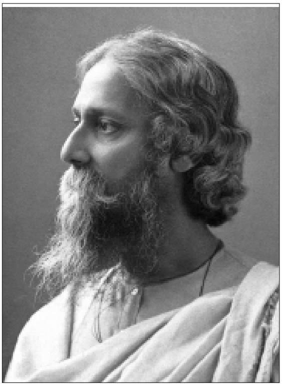
রবীন্দ্রনাথ

প্রথম প্রবন্ধের শুরুর দিকেই তিনি অবশ্য টেনে এনেছেন বদরুদ্দীন উমরের বাঙালিত্বের পঞ্চাশ বছরের পুরানো সংজ্ঞা: "বাঙলাদেশের যে-কোন অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাঙলা ভাষায় কথা বলে, বাঙলা দেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাঙলার ঐতিহ্য নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে, তারাই বাঙালি"। লেখক পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব ও ডায়াসপোরার বাঙালিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে সংজ্ঞাটিকে সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁর দেয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞাটিও প্রণিধানযোগ্য: "সংস্কৃতি অর্থ কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বীকৃত ও সুবিন্যস্ত আচরণরীতি:

বস্তুগত অর্জন, বুদ্ধিগত বিকাশ ও আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা তার অন্তর্গত। ঘর-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পসাহিত্য এবং ধর্ম ও দর্শনচিন্তা—এ সবই সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ"। পরের আলোচনা এই আলোকেই এগিয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলোকে একটা বইয়ের ঐক্য দিয়েছে।

'সংস্কৃতি' শব্দটি কীভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে, তা জেনে সবারই মন ভরবে: স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর অনুমোদনের সাথে জড়িত ছিলেন: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক মারাঠি জ্ঞানী বন্ধুর কাছ থেকে এটি নিয়ে এসে বিশ্বকবির কাছে পাঠান। এর বিপরীতে ছিল যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রস্তাবিত 'কৃষ্টি'। রবীন্দ্রনাথের কাছে শেষেরটিকে 'কুশ্রী' মনে হয়েছিল। এটা সেই সময়ের কথা যখন বাচ্চাদের নাম কী হবে, বা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বা সিনেমা হলের সাইনবোর্ডে কী লেখা থাকবে, সেজন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ চাওয়া হত, তিনি চিঠিপত্র পেতেন। সুতরাং 'কুশ্রী' কৃষ্টি যে রবীন্দ্রনাথ-সমর্থিত সংস্কৃতি-র কাছে দাঁড়াতে পারবে না, তাতে আর কী বিস্ময়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা বা বাঙালি নাম কোথা থেকে এসেছে, সে নিয়ে বিতর্কও কম নয়। এবং সে-বিষয়টির সুরাহা হয়েছে, এমনও নয়। প্রবীণ লেখক এবনে গোলাম সামাদ তাঁর এক লেখায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এ সংক্রান্ত ভিন্ন

মতের উল্লেখ করে জানিয়েছেন: একজন বলতেন, দেশের নামানুসারে হয়েছে বাঙালি জাতির নাম, আরেকজন বলতেন ভাষার নামানুসারে হয়েছে—বা হতে হবে—জাতির নাম। একটা গুরুভার বিষয়ই বটে যা নিয়ে কথা চলতেই পারে। সুকুমার সেনের এই মহামূল্যবান বক্তব্য আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জানাচ্ছেন যে, বাংলা ভাষার উৎপত্তির সাথেই বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু।

বাঙালির বিজ্ঞান চর্চা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলায় অবদান এসবই এসেছে আলোচনায়। পাহাড়পুরের বিহার, নানান ধরনের মূর্তি তৈরির প্রসঙ্গ তিনি উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞান ও গণিতে নিম্ন মানের অর্জন—এখানে শিল্পবিপ্লব সম্ভব ছিল না—আবার সাহিত্য ও সংগীতের এই সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিমাণে হাজির-হওয়া, একথাটি আমরা যেমন পাই; তেমনি আবার তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন ড. শহীদুল্লাহর এই মত যে, এদেশ "পৃথিবীকে তিনটি ধর্ম দিয়েছে: প্রাচীন যুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম, মধ্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আর আধুনিক যুগে ব্রাহ্মধর্ম"। শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের কথাও এসেছে তাঁর আলোচনায়; আমাদের উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের সংস্কৃতির পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, যদিও মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদী হুংকারে এবং বিভিন্ন দিবস পালনের উল্লাসে অনেক সময়েই ধনী দরিদ্রের পার্থক্য

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

চাপা পড়ে থাকে। লেখক এ বিষয়ে নিজেকে দৃষ্টিহীনদের থেকে আলাদা করেছেন। আবার সত্যজিৎ রায়ের অবদানকে উল্লেখ করে বাঙালিত্বকে যারা বৃহত্তর চোখে দেখেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

'স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, "স্বাধীনতার সূত্রে বহু শব্দ যে আমাদের ভাষায় প্রবেশ করেছে, সেটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার"। আবার স্বাধীনতার কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার পরেও আমরা আবার অনেক সমস্যা তৈরি করেছি, সে-বিষয়টি জানাতেও তিনি পিছপা নন। দেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগুলোর প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করেই তিনি বললেন, নাগরিকদের বাংলাদেশী পরিচয় সমীচীন হয়েছে। স্বাধীনতার সর্বতোমুখী বিকাশের তিনি অপেক্ষায় আছেন। এই অপেক্ষা আমাদের সবারই।

'প্রাতিষ্ঠানিক উদ্‌যোগ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে একটা মোক্ষম কথা তিনি বলেছেন, যা শিরোধার্য হওয়া উচিত ভাষা নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের সবার: "আমাদের বাংলা একাডেমি আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমির মধ্যে সম্পর্ক উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হবে বলে আমরা আশা করি।" এই আশা বাংলা ভাষার সকল শুভাকাঙ্ক্ষীরই। কারণ তা না-হলে কোনো এক দূরের দিনে ভাষাটি দুই পথে যাত্রা করবে; এবং ইতিহাসের আরও দূরের মুহূর্তে দু-টি ভিন্ন ভাষা হিসেবে পরিচিত হবে। শুধু এ দু-জায়গায়ই নয়, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড ও আসামের বাংলা-অঞ্চল এবং ডায়াসপোরার বাংলাভাষী সবারই তো একটা মতামত থাকতে পারে।

আরেকটা কথা: "সংস্কৃতির সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটলে এবং দেশের সকল মানুষের জীবনকে তা স্পর্শ করলে স্বাধীনতার প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হবে"—এটা এক মহৎ প্রত্যাশা। আসলেই খোলা মাঠে রাতভর উচ্চাঙ্গ সংগীতের আয়োজন সমাজের কত জনের সংস্কৃতি বা এমনকি অনেকটা ধর্ম-স্তোত্রের রূপ পাওয়া রবীন্দ্রসংগীতকে উপভোগ করার ক্ষমতা সিলেটে যে-লোকটা পাথর খুঁড়ে বের করতে জীবন হারান, তাঁর ছিল কিনা, সে-প্রশ্নটি উঠবেই। শ্রেণিতে-শ্রেণিতে যে-বৈষম্য, যার কথা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেছেন, তা হয়তো আরও অনেক দিন থাকবে, কিন্তু সর্বনিম্ন একটা জীবন ধারণের ব্যবস্থা যে-কোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত। তা না হলে 'রাষ্ট্র' 'স্বাধীনতা' 'সংস্কৃতি' 'রাজ্য', রাজ্যের নাম পালটানো, বানান সংস্কার—এসবের অর্থ খুব একটা থাকবে না।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বাংলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বীকৃতির ব্যাপারে উদার, বানান প্রশ্নে তাঁর নিজস্ব অবস্থান আছে—অন্তত আমার তা-ই মনে হয়েছে, শ্রেণি-বিভক্তিতে তিনি হতাশ আর সবচেয়ে বড়ো কথা, দুনিয়ার সব বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনি সমন্বয় চান, একজন বাংলাভাষীর জন্য একটি বই থেকে এর অতিরিক্ত আর কী প্রত্যাশা থাকতে পারে?

আলোকচিত্রগুলি আন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত।

লেখক বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব এবং কৃতী অনুবাদক।

সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা অবৈতনিক শুধু নয়, পরন্তু প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যেতে হয় এবং তা না পাঠালে পিতামাতাকে, অভিভাবকবর্গকে শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। আমাদের দেশের শিক্ষাও এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কে তার কথা ভেবেছে? আজ স্বাধীনতা–উত্তরকালের বিংশ বর্ষেও রবীন্দ্রনাথ–কথিত আমাদের সেই শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব এখনো তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কবে যে আমরা এর দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাব, তা আজও জানি না।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির ... নবশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু ব...তে পারি এটা বাহ্য। ... শিক্ষা ব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার ...য়ে মর্মান্তিক।" আমাদের রা...বিধানে আজ প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। শুনতে পাই রাষ্ট্রনায়...রা বলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্মচ...ীর আজ চিন্তা করা দরকার যে, তাঁরা দেশের সেবক, ...তরাং দেশবাসীর উন্নতিকল্পে স...র্বিধ কার্যের অনুষ্ঠান করা তাঁদের কর্তব্য। কিন্তু কার্য...ত্রে দেখা যায় কেউই দেশবাসী... কথা ভাবেন না। বর্তমানে লোকেদের ধারণা হয়েছে ক...ার ইচ্ছায় কর্ম, সুতরাং তাদের দ...য়িত্ব দেশবাসীর কাছে নয়, তাদের দায়িত্ব লোকবিশে...র কাছে। ফলে শাসনবিধির সঙ্গে সম...জের ব্যবধান তেমনি রয়ে গেছে। আর আমাদের ...শিক্ষার যুগ এখনো কেটে যায় নি, আশা... আলোক নিয়ে জীবনে নবীন উষার আগমন ...খনো বহু দূরে।

একটা কথাই ...রা যাক। আমা... ও দেশের শিক্ষা... ভাষার তারতম্য অনেকখানি। স্বাধীন...া–পূর্ব যুগে যে ভাষা...রিহার করবার জন্য স...া দেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, যে ভাষার ...তি ধীরে ধীরে যুগে যু... বিরাট একটি বিতৃষ্ণা ...গে উঠেছিল, যাকে ত্যাগ করবার জন্য প্র... মানসিক চাঞ্চল্যে... সৃষ্টি হয়, এবং স্বা...নতা–সংগ্রামকালে যে ভাষাকে আশু পরিত্যাগের ...জন্য সারা যুবস...প্রদায় চঞ্চল হ... উঠেছিল, আজও দেখি স্বাধীনতা–উত্তর গত বিশ বৎস...ও এই পরিব...নের কোনো ...বস্থা বিশেষভাবে কেউ করছে না। অথচ যেমন রবীন্দ্রনাথ ম... করতেন, ...তমনিভাবে ...ান বিদেশী ভাষার অস্বাভাবিক অনিষ্টকর প্রভাব অন্তর দিয়ে বুঝেছি... বলে ১...৪৯ সালে... নিজেদের কার্যবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি নিজের ভাষায় পরিচালিত করতে লেশ...াত্র দ্বিধা করে নি... আজ তার সুফল সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে। চীন আজ বিশ্বে তার বিশিষ্ট ...্থান ...ধিকার করতে চলেছে। তারা শিক্ষার ভাষা পরিবর্তন করে প্রায় স্বাধীনতার স... স...ে, ...ন্তু আমরা তাদের দু বছর আগে শাসননিয়ন্ত্রণের সুবিধা পাই, তথাপি ...নি...বে... আমরা বিদেশী ভাষার দাসত্ব–শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি যে, আজও আমরা ...ার ...প্রভ... বুঝতে পারি না, পরন্তু ওকে দেহের আভরণস্বরূপ ধরে নিয়েছি এবং ই...রাজ দা...ত্বের পরিবর্তে ইংরেজির দাসত্বকে সমাজজীবনের আবশ্যিক ব্যবস্থা মনে করতে কুণ্ঠিত হই না। আজ তাই কোনো শিক্ষিত লোকের মুখে যখন শুনি আমরা ইংরেজি পরিহার করতে পারব না, তখন মনে করি যে, সে লোকের শিক্ষা কোনো দিনই সম্পূর্ণতা পায় নি। পরন্তু তাঁরা সেই কুশিক্ষার জালে আবদ্ধ যা তাদের নিশ্চিতরূপে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, এবং তাঁদের অনুবর্তীগণ সারা দেশে বিরাট অশান্তির সৃষ্টি করবে। দেশের উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হবে।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, "শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্বীকৃত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটা জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এ সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে

আ হ মা দ মা য হা র

আনিসুজ্জামান: শিক্ষকতা সাহিত্যিকতা ও সামাজিকতা

আনিসুজ্জামান ছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতি প্রবাহের এক প্রত্যক্ষ ইতিহাসসূত্র। তাঁর মৃত্যুতে জ্ঞানগত বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য একটি উৎসের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিন্ন হয়ে গেল। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর লেখা পড়ে, তাঁর সঙ্গে কাজে যুক্ত থেকে অনুভব করেছি তাঁর ব্যক্তিত্বে গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তিনটি দিক—একটি বিদ্যায়তনিক, দ্বিতীয়টি সাহিত্যিক, অন্যটি সামাজিক। তিনি নিজেও এই তিন সত্তার এরকমই ধারাক্রম করেছিলেন। এই তিন স্রোতের সংশ্লেষের

মধ্য দিয়েই ক্রমশ বিকশিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কাছে মানুষের প্রত্যাশাও থাকত এই তিন দিক থেকেই। অনেকেই এই ভিন্ন ভিন্ন দিকের দাবি থেকে তাঁকে মূল্যায়ন করেন। এক দিক থেকে দেখতে গিয়ে অন্য দিক থেকে না-পাওয়ার হতাশা কখনো-কখনো প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁদের মূল্যায়নে। তবে এ কথা ঠিক, এই তিনের সমন্বয়ে অখণ্ড মূল্যায়ন করলে যে আনিসুজ্জামানকে পাওয়া যায় তার গুরুত্ব আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল থাকবে।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে আমাদের কৈশোরোত্তীর্ণ বয়স থেকেই বাংলাদেশে বাংলাসাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে যে দু-একজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনেছি তাঁদের মধ্যে আনিসুজ্জামান অগ্রগণ্য। ক্রমশ অনুভব করেছি, তিনি কেবল সাহিত্য-গবেষকই নন, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তীয় নাগরিক-সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাসের একজন অংশী, সাক্ষী এবং বিশ্লেষক। একদিকে তিনি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক, সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও কর্মী, অন্য দিকে সামাজিক এলিট। তাঁর বিদ্যায়তনিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক এই তিন ক্ষেত্রেই তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে এতটাই অনিবার্য ছিলেন যে তাঁকে ছাড়া প্রায় চলতই না। বিদ্যায়তনিক কাজে যদি তিনি নিবিষ্ট থাকতে পারতেন তাহলে হয়তো বাংলার ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাসের অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ঘটত। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর মতো পরিমিত, সংস্কৃত, সময়ানুবর্তী, বিবেচক ও ভারসাম্যময় মানুষের এতটাই অভাব যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে সবসময়ই দাবি জন্মেছে তাঁর ওপর।

ফলে একেও উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর এই তিন সত্তার গুরুত্ব মেনে নিয়েও অনেককে এই বলে খেদোক্তি করতে শুনেছি যে, বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে আনিসুজ্জামানের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল; এই ক্ষেত্রে তাঁর উপেক্ষা আমাদের বঞ্চিত করেছে। সামাজিক দায় মেটাতে গিয়ে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে যোগ্যতার তুলনায় সময়াভাবে অনেক কিছুই হয়তো করতে পারলেন না তিনি।

২

আনিসুজ্জামান বাংলার মুসলিম আধুনিকতামুখী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথম প্রজন্মের উত্তরাধিকার বহন করেছেন। তাঁর বড়ো বোনও নিয়মিত কবিতা লিখতেন। এ থেকেও বোঝা যায়, তাঁদের পরিবারে আধুনিকতার হাওয়া তখনই বেশ প্রবল ছিল। শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এই রকম পরিবারের পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি তিন বোনের ছোটো, ভাইদের মধ্যে সবার বড়ো।

আনিসুজ্জামানের জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার এন্টালিতে (৩১ ক্যান্টোফার লেনে)। তাঁর বাবা এ টি এম মোয়াজ্জেম ছিলেন বিখ্যাত হোমিয়ো চিকিৎসক। গৃহিণী হলেও মা সৈয়দা খাতুন লেখালেখি করতেন। পিতামহ শেখ আবদুর রহিম ছিলেন বাংলার মুসলিম সমাজের পরিচিত মুখ, খ্যাতিমান একজন লেখক ও সাংবাদিক। তাঁর পিতামহ সম্পর্কে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম সমাজের রেনেসাঁসের প্রাথমিক পর্যায়ের

লেখকের সঙ্গে

অন্যতম প্রতিভূ। আমি নিজে আনিসুজ্জামানের নাম জানার আগেই তাঁর পিতামহ সম্পর্কে জেনেছিলাম বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলির একটি খণ্ডের সূত্রে। ওই খণ্ডে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর একটি জীবনীধর্মী বই সংকলিত হয়েছিল। পরে খোঁজ করে দেখেছি যে আমি শেখ আবদুর রহিমের *হজরত মুহম্মদ স: জীবনচরিত ও ধর্মনীতি* বইটি পাঠ করেছিলাম। উল্লেখ্য যে, কোনো বাঙালির লেখা এটিই হজরত মুহম্মদের প্রথম জীবনী। সেকালের বিবেচনায় একজন বড়ো মাপের লেখক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। তাঁর নাতির তো বিখ্যাত হয়ে উঠবারই কথা, আনিসুজ্জামান সম্পর্কে জানবার পর এমন মনে হতে পারে।

আনিসুজ্জামানের শিক্ষাজীবন বর্ণাঢ্য। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশমানতায় ছোটোবেলা থেকেই শিক্ষাজীবন যে-রকমভাবে এগিয়ে চলেছে তা-ই ছিল পরবর্তী কালের জীবনচর্যার ভিত্তি। তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কলকাতার পার্ক সার্কাস হাইস্কুলে পড়েছেন। দেশভাগের পরে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন খুলনা জেলা স্কুলে। পরের বছরই পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় এসে প্রিয়নাথ হাইস্কুলে (পরে নাম বদলে হয় নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল) ভর্তি হন। এখানেই পড়েন ১৯৫১-তে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিক পাস করা পর্যন্ত। গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে। জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন ১৯৫৩-তে। ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স এবং ১৯৫৭-তে একইভাবে এমএ পাশ করেন। বাংলা একাডেমির

প্রথম গবেষণা বৃত্তি পান ১৯৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এক বছর পরেই বাংলা একাডেমির বৃত্তি ছেড়ে শিক্ষক হিসেবে সেখানে যোগ দেন। এর আগে ‘নীলকান্ত সরকার’ বৃত্তি লাভ করেন সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৃতিত্বস্বরূপ। পরে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা বৃত্তি পান। ‘ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা ১৭৫৭-১৯১৮’ বিষয়ে ১৯৫৮-তে গবেষণা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২-তে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪-তে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে বৃত্তি নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ডিগ্রি সম্পন্ন হয় ১৯৬৫-তে। গবেষণার বিষয় ‘উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস: ইয়ং বেঙ্গল ও সমকাল’। বিদ্যায়তনিক জীবনের প্রথম দিককার এইসব গবেষণা তাঁকে সারা জীবন ধরে পথ দেখায়।

আনিসুজ্জামান ছিলেন ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক। মাত্র ২২ বছর বয়সে, ১৯৫৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের শুরু, সেই তরুণ বয়সেই ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। ১৯৬৯-এর জুন মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন বাংলা বিভাগের রিডার পদে। ১৯৭১-এর ৩১ মার্চ ভারতে যান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। প্রথমে দায়িত্ব পালন করেন শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন ‘বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি’র সাধারণ সম্পাদকের। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা সূত্রে তাঁর সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের নানা দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৪-৭৫ সালে কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমি স্টাফ ফেলো হিসেবে তিনি গবেষণা করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগে (SOAS)। জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-প্রকল্পে অংশ নেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। সেখান থেকে অবসর নেন ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। পরে আবার যুক্ত হন সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস, ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অভ এশিয়ান স্টাডিজ (কলকাতা), প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং ফেলো। এছাড়াও তিনি নজরুল ইনস্টিটিউটের ও পরে আমৃত্যু বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৮-র ১৯ জুন বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়। সূচনাকাল থেকেই তিনি বেঙ্গল ফাউন্ডেশন প্রকাশিত শিল্পকলা বিষয়ক ইংরেজি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘যামিনী’ এবং আমৃত্যু বাংলা মাসিকপত্র ‘কালি ও কলম’-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল। তাঁর জীবনকালে সবগুলো বড়ো জাতীয় আন্দোলন, যথা মহান ভাষা আন্দোলন, রবীন্দ্র-উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

৩

আনিসুজ্জামানের বইগুলো সুশৃঙ্খল তথ্যের সংরক্ষণ ও উপস্থাপনে উজ্জ্বল। ব্যক্তিগত জীবনেও তথ্য সংরক্ষণে তাঁর শৃঙ্খলাবোধ উত্তরপ্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয়। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কোথায় কোন্ অনুষ্ঠানে যেতে হবে তার তথ্য যেমন তিনি রক্ষা করতেন তেমনি কোথায় কী করলেন তা-ও তিনি সবসময় টুকে হালনাগাদ করে রাখতেন। বাংলাদেশের সারস্বত সমাজের মানুষের টেলিফোন নম্বর সংরক্ষণের জন্য যেমন রয়েছে তাঁর নিজস্ব তথ্যপুস্তক তেমনিভাবে ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য রয়েছে আলাদা খাতা; তেমনটিই রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরের ব্যক্তিদের জন্যও। এই যে সুশৃঙ্খল তথ্যবিন্যাসের অনুশীলন এটি তাঁর গবেষকসত্তারই একটি দিক। তাঁর কাছ থেকে এ-ও শিক্ষণীয়। স্মরণীয় যে, তাঁর সংরক্ষিত তথ্যের সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা পরবর্তীকালে এমন একটি গ্রন্থের রূপ পেয়েছে যা এখনও বাংলাদেশের বিদ্যোৎসাহী অনেকের কাছেই প্রাথমিক আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। প্রসঙ্গত তাঁর রচিত *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৯৬৯) বইটির কথা উল্লেখ্য। এটি তাঁর 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা ১৭৫৭-১৯১৮' শীর্ষক গবেষণার বিবর্তিত রূপ *মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য* রচনার উপজাত তথ্যাদির সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা। নীহাররঞ্জন রায়ের মতো খ্যাতিমান ইতিহাসবিদও ১৯৭১-এ তাঁর *মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য* বইয়ের প্রথম কলকাতা সংস্করণ প্রকাশের সময় বইটির সম্পর্কে ভূমিকা লিখতে গিয়ে ভূমিকা লেখার দশ-এগারো বছর আগে পাওয়া তরুণ গবেষক

আনিসুজ্জামানের পাণ্ডুলিপি দেখে 'গবেষকের শ্রম, নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসায়, তাঁর তথ্যসংগ্রহের শৃঙ্খলায়, তাঁর তথ্যনির্ভর যুক্তিতে, সর্বোপরি তাঁর স্বচ্ছ মুক্ত বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্যে সাতিশয় প্রীত ও বিস্মিত' হয়েছিলেন।

৪

নিতান্ত কৈশোরোত্তীর্ণ বয়সেই তাঁর চিন্তাভাবনায় সমাজ ও ইতিহাসবোধের জাগরণ ঘটে। তাঁর চিন্তাসামর্থ্য এতটাই পরিণত হয়ে-ওঠে যে স্নাতক সম্মান শ্রেণির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা কালেই লিখে ফেলেন বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাস নিয়ে আলোচনামূলক প্রবন্ধ যা-তে তিনি উল্লেখ করতে পারেন, এতে 'স্বাধীনতার প্রেরণাও আছে আবার সম্প্রদায়িকতাও আছে'। প্রসঙ্গত স্পষ্ট করেই বলতে পারেন, এই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি তৎকালীন সমাজ; এমন সিদ্ধান্তও টানেন যে, দেশভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এর কাছাকাছি সময়ে সম্মান শ্রেণির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা কালেই লেখেন 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুনর্জাগরণের পটভূমি'। প্রবন্ধটির উপজীব্য বাংলার মুসলমানদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সাম্প্রদায়িকতা তথা হিন্দু বিদ্বেষী চেতনার সঙ্গে ওই সময়ের অপরাপর চিন্তাভাবনাগুলোকে মিলিয়ে দেখা। এই প্রবন্ধটি পড়েই শিক্ষক অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁকে গবেষণায় উৎসাহিত করেন।

স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পরপরই তিনি গবেষণায় ব্যাপৃত হন। তাঁর গবেষণাপত্র 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে

'প্রথম আলো'র প্রীতি সম্মিলনিতে পত্রিকার বর্তমান ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কবি সাজ্জাদ শরীফ, অভিনয়শিল্পী সুমাইয়া শিমু, পুষ্টিবিদ শাওন আজিম, অভিনয়শিল্পী শিরীন বকুল ও লেখকের সঙ্গে

বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা ১৭৫৭-১৯১৮’ এরই ফল, তাঁর লিখিত বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত *মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য* (১৯৬৪) এরই পরিণতি। প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন *স্বরূপের সন্ধানে*-র (১৯৭৬) প্রবন্ধগুলো তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজেতিহাসবোধের পরিচায়ক। চর্যাগীতিকার ও মধ্যযুগের সাহিত্যের সমাজচিত্র, ১৮৭০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সময়ের বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাবজগৎ ও ১৯৪৭-১৯৭১ পর্বের বাংলাদেশের লেখকদের মানসবৈচিত্র্যকে ‘স্বরূপের সন্ধানে’ প্রবন্ধে ধারণ করেছেন। এইখানেও তিনি তাঁর সেই সমাজেতিহাসবোধেরই গভীরতা ও বিস্তৃতির পরিচয় দেন। এই বইয়ে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে তার সারকথা এই: সাহিত্য বা সংগীত অনেকখানিই সামাজিক কাঠামো-নিরপেক্ষ বা সামাজিক কাঠামো-উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু ঐ সামাজিক কাঠামো না থাকলে সেটা যে আসে না তা-ও আমাদের বুঝতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পরের লেখাপত্রেও প্রবহমান ছিল।

প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি তাঁর *আমার একাত্তর* (১৯৯৭), *কাল নিরবধি* (২০০৩) বা *বিপুলা পৃথিবী* (২০১৫) বইয়ের কথা। এই বইগুলোতে উল্লিখিত ঘটনায় তাঁর অংশগ্রহণের কথা এমন নৈর্ব্যক্তিক ও নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস আছে যে তা আমাদের বিস্মিত না-করে পারে না। এর মধ্যে তাঁর ইতিহাসচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িত বড়ো বড়ো মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর জানাশোনা ছিল। সেই জানাশোনার কথা বলতেই আত্মজীবনী লিখে ফেলা দরকার মনে করেছিলেন তিনি!

এই ধরনের রচনায় আনিসুজ্জামান ইতিহাস সন্ধানের সামগ্রিক দৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন, আমাদের বিদ্বৎসমাজে ইতিহাসের সমগ্রতা নানা কারণে খণ্ডিত—আর সেই খণ্ডগুলোকে দু-দিক দিয়ে দেখলে দু-রকম দেখায়; অর্থাৎ একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না। আবার যে-খণ্ড বৃহতের অংশ সেই খণ্ডটাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বৃহৎটা চলে যাচ্ছে আড়ালে। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, খণ্ডতার মধ্যে অখণ্ড মানবসত্তাকে এবং ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানানুসন্ধানের ঐক্যকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে আমাদের শঙ্কা ও সন্দেহকে দূর করবেন।

৫

আনিসুজ্জামানের রবীন্দ্রচর্চার একটা বড়ো মাত্রা আছে। পূর্ব-পাকিস্তানে ১৯৬১-র রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে তিনি নিজে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। পরে সম্পাদনা করেন বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার আত্মচারিত্র্য নির্দেশক রচনা সংকলন *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৮), এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলাদেশের বিশিষ্টজনদের যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা-তে ছিল বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিবেচনার এমন নানা দিক যার প্রভাব উত্তরকালে দীর্ঘ সময় ধরে ছিল ক্রিয়াশীল, এমনকি এখনও আছে। অনেক পরে রবীন্দ্রজন্মের ১৫০ বছর পূর্তির কালে তিনি সম্পাদনা করেন *রবীন্দ্রনাথ: এই সময়ে* [প্রথম আলো আয়োজিত রবীন্দ্র সার্ধশত বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ ও আলোচনার সংকলন] (২০১২)।

সার্ধশতবর্ষে *রবীন্দ্রনাথ: বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি* [বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা থেকে প্রকাশিত] (২০১২), রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা উপলক্ষ্যে সারা জীবন ধরেই প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। জীবনব্যাপী এই নিজস্ব রবীন্দ্রচর্চাও একটা সমগ্ররূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভিন্ন সময় লেখা *রবীন্দ্রনাথ: একালের চোখে* (২০১১) ও *তাঁর সৃষ্টির পথ* (২০১৬) নামে দু-টি প্রবন্ধের সংকলন এরই পরিচায়ক। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা পরিচালিত সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সুরের ধারা' এবং দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকার রবীন্দ্রনাথের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানমালার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং নির্দেশনা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির উপকরণ অনুসারে বাংলা গদ্য নিয়ে আনিসুজ্জামানের গবেষণা বাংলা গদ্যের ইতিহাস বিষয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার মুখোমুখি করে। *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India official Library and Records* (১৯৮১), *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮৩) এবং *পুরোনো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪) এই পুনর্বিবেচনার উৎস। এই গবেষণাকে আরও পরিণত করার উপকরণ তাঁর সংগ্রহে ছিল। তা সত্ত্বেও কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে নিজের খেদও ছিল দীর্ঘকাল। মৃত্যুর আগে তা সম্পন্ন করে যেতে চান এমন আশাবাদও ছিল তাঁর।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব নিয়ে এতকাল ধারণা ছিল, এর জন্ম উপনিবেশের সূত্রে। কিন্তু তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত: ব্রিটিশ

উপনিবেশ আমলের বহু আগে থেকেই বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বিকশিত হয়ে উঠছিল বাংলা গদ্য। এর ব্যবহারও বাড়ছিল নানা ক্ষেত্রে; আর বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নয়, ছিল ভাবের বাহন হিসেবেও। তিনি মনে করেন, এটি বিকাশ লাভ করতই। যদিও তাঁর ধারণা বাঙালির জীবনে পদ্যের অসাধারণ প্রভাব গদ্যকে দীর্ঘকাল আড়ষ্ট করে রেখেছিল বলে গদ্যে লেখা উচিত এমন বহু বিষয় নিয়ে অতীতে পদ্যেই লেখা হত।

আনিসুজ্জামানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যায়তনিক কাজ ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত ওগুস্তেঁ *ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংকলিত বাংলা-ফরাসি শব্দের সর্বপ্রথম সংগ্রহ* (২০০৩)। ১৯৮১-তে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজের সূত্রে তিনি প্যারিসে যাবার সুযোগ পান। তখন ফ্রান্সের বিবলিওথেক নাসিওনালে-তে ওগুস্তেঁ ওসাঁর বাংলা ফরাসি শব্দমালার সন্ধান পান। তারই পরিণতি *বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ*।

৬

গবেষণাকর্ম ছাড়াও বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি। এসব প্রবন্ধের উপজীব্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিবিশেষের কৃতি কিংবা বিশেষ বিষয়ে চিন্তা। লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু প্রবন্ধ। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভীষ্টের আদর্শ কী হওয়া সংগত অনেক প্রবন্ধে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট তাঁর চিন্তন প্রক্রিয়ায় সবসময়ই তাড়া করেছে বলে তাঁকে

নানা সময় প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। এইসব প্রবন্ধে তিনি চেষ্টা করেছেন আমাদের সমাজের ভাবগত ইতিহাস রচনা করতে। গভীর ইতিহাসবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই ধরনের প্রবন্ধে। তাঁর প্রবন্ধগুলোতে আধুনিক বাঙালি জীবনে নারীপ্রশ্নও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে এসেছে। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের মনোযোগী পাঠ আমাদের পথ দেখাবে অনেক কিছুর।

নিজের জীবনের অভিযাত্রায় আনিসুজ্জামানের যেমন ছিল ইহজাগতিকতাবোধের নির্দেশনা তেমন অনুভব ছিল রাষ্ট্রচেতনায়ও। রাজনীতি তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল না বটে, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির ভিত্তিমূলের অনুসন্ধান ছিল তাঁর সত্তায় ক্রিয়াশীল। তিনি অনুভব করেছিলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ইহলৌকিক বিষয় থেকে পারলৌকিক বিষয়কে সচেতন ভাবেই পৃথক রাখা হয়েছিল। মুক্তি অর্জনের পর রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণার মূলে যে-ভাবটি কার্যকর ছিল তা এই যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকের ইহলৌকিক কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হওয়া—তার কমবেশি নয়। কিন্তু তিনি অনুভব করেছেন, তা সত্ত্বেও পাছে তা নাস্তিকতা বলে বিবেচিত হয় সেই ভয়ে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণে আমরা যতটা কার্যকর হয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি উদ্যোগী হয়েছিলাম সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে। অথচ ধর্মীয় সহনশীলতা আর ধর্মনিরপেক্ষতা যে এককথা নয় সে-বোধও সেসময় ছিল সক্রিয়। কিন্তু পরের নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ পরিত্যাগ করেছে। কেবল তা-ই নয়, তারা প্রশ্ন তুলেছে সকল ধর্মমতের সমানাধিকার থাকবে কিনা তা নিয়ে। তাঁকে বেদনাহত করেছে যে, ইহজাগতিক ব্যাপারে

বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সংগীত উৎসবে অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা, লেখক ও চ্যানেল আইয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও ছড়াকার আমীরুল ইসলামের সঙ্গে

রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়টি দূরে চলে গেছে, কাছে এসে পড়েছে বিশেষ ধর্মমতের আদর্শে রাষ্ট্রীয় জীবনকে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব। এত কিছুর পরও ইহজাগতিকতার ওপর তাঁর আস্থা কখনো কমেনি। তিনি আস্থাশীল ছিলেন যে, "মানুষের হাতে আজ যেমন আত্মধ্বংসী ক্ষমতা আছে, তেমনি আছে সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনার শক্তি। শুধু ধ্বংসের পথ পরিহার করা নয়, সামাজিক অসংগতি দূর করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মধ্যেই সেই অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নিহিত রয়েছে। যে পথ সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোয়, সেটাই ইহজাগতিকতার পথ।" সেটাই তাঁরও কাঙ্ক্ষিত!

রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি যেমন ইহজাগতিকতার পথের অনুসারী তেমনি সমর্থক বাঙালি জাতির মধ্যেকার সাংস্কৃতিক বহুত্বেরও। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর 'সাংস্কৃতিক বহুত্ব' প্রবন্ধের মর্মকথা, "যে বহুত্ব ঐক্যে উপনীত হয় না, সেই বহুত্ব আসলে বিশৃঙ্খলা। যে ঐক্য বহুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা জুলুম। আমি দু'য়ের মিলন আকাঙ্ক্ষা করি।" তাঁর ইহজাগতিকতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের এই বোধ আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য সত্য। *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর* (১৯৯৮), *আমার চোখে* (১৯৯৯), *বাঙালি নারী: সাহিত্যে ও সমাজে* (২০০০), *পূর্বগামী* (২০০১), *বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য* (২০১২), *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য* (২০১২) [কলকাতা], *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক* (২০১৩), *চেনা মানুষের মুখ* (২০১৩), *বাঙালি ও বাংলাদেশ* (২০১৬) [কলকাতা], *আত্মপরিচয় ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা* (২০১৫), *বিদ্যাসাগর ও অন্যেরা* (২০১৮), *সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি*

(২০১৯)—এইসব বইয়ে সংকলিত তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তা পূর্বোক্ত কেন্দ্র দৃষ্টিকেই সামনে এনেছে বারবার।

৭

ছাত্র থাকাকালে আমার ক্লাসনোটের খাতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ১৯৮৬-র ১৩ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে এমএ ক্লাসের ছাত্র হিসেবে ২০১৭ নম্বর শ্রেণিকক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সরাসরি পরিচয় হয়। ১৯৮৪ সেশনের ছাত্র হলেও সেশনজটে পড়ে প্রায় দুই বছর পিছিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যাই। ১৬ বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আমাদের ক্লাস শুরু হবার মাত্র কিছুদিন আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। ততদিনে তিনি সমাজে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সেই থেকে তাঁর শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সামাজিক এই তিন সত্তার সঙ্গেই আমার যোগসূত্র চলমান থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছিলাম সনাতন পদ্ধতির স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী। ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতক-সম্মান সম্পন্ন করে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম! আমাদের তিনি পড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের *বলাকা* আর বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী*, *কপালকুণ্ডলা* ও *মৃণালিনী* উপন্যাস। আমাদের ক্লাসেও তিনি যেভাবে কথা বলতেন তা ছিল সহজ; কথা বলার ভঙ্গি ছিল নৈর্ব্যক্তিক। সমাজ বিবেচনা কিংবা দার্শনিকতার দিকটিতে সামান্য যতটুকুই আলো ফেলতেন তা শিক্ষার্থী হিসেবে আমার সে-সময়ের অমনোযোগিতার কারণে অনুধাবন করে উঠতে পারিনি সবটা। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে,

শ্রেণিকক্ষে অল্পকালের ছাত্রত্বে আমি তাঁর কাছ থেকে যতটা না শিখতে পেরেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি পরবর্তী কালে জীবনের বিচিত্র পর্বে। নব্বইয়ের দশকে আমার আরেক শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নির্দেশনায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে নানা ধরনের ছোটো ছোটো সেমিনারের আয়োজন করতাম আমরা। প্রায়শই আনিসুজ্জামানকে আমন্ত্রণ জানাতে হত কথা বলবার জন্য বা সভাপতিত্ব করবার জন্য। সেই সূত্রেই তাঁর সাহচর্য পাওয়ার শুরু। পরে আরও নানা কাজে যুক্ত হয়েছি বা তাঁর কাছে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমার সাম্প্রতিকতম কাজ 'রবীন্দ্র-সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্ব। বাণিজ্যিকতার চেয়ে দেশের কাঙ্ক্ষিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে উচ্চে স্থান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারি অনুমোদন পায়। অনুমোদন পাওয়া-পর্বের কাজগুলো আমিই সমন্বয় করতাম তাঁর নির্দেশনায়।

আমার সাহিত্য চর্চাকেও আনিসুজ্জামান প্রভাবিত করেছেন নানা রকম দায়িত্ব দিয়ে। সুরুচি সম্পন্ন লিটল ম্যাগাজিন 'ঊষালোকে'-এর সম্পাদক বন্ধু মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০৪-এ আমি যখন হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী* উপন্যাস নিয়ে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখি তার দুই বছর পর ২০০৬-এ ছিল হুমায়ুন কবিরের জন্মশতবর্ষ। তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য দেশের বিদ্বৎসমাজের একটি উদ্‌যাপন কমিটি গঠনের কথা ভাবা হয়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ভাবেই আনিসুজ্জামানেরই এইসব উদ্যোগে থাকবার কথা।

হুমায়ুন কবিরের ভ্রাতুষ্পুত্রী খুশী কবির প্রধানত তাঁর ওপরই নির্ভর করেছিলেন উদ্যোগটি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। ওই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আনিসুজ্জামান আমার নাম প্রস্তাব করেন। ওই কমিটির সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য ছিলেন কবি আবুল হোসেন আর কনিষ্ঠতম ছিলাম আমি। সবচেয়ে প্রবীণ ও হুমায়ুন কবিরের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে জীবিত কবি আবুল হোসেনকে সবাই মিলে সভাপতি নির্বাচন করেন। আনিসুজ্জামানের প্রস্তাবে আমাকে দেয়া হয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। শুধু তাই নয় হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে একটি স্মরণিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্বসহ তাঁকে নিয়ে মূল প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বও তাঁরই প্রস্তাবে দেয়া হয় আমাকেই। তাঁর উপদেশনায় সে-আয়োজন পালিত হয়েছিল অত্যন্ত সফলভাবে। অনেক পরে, ২০১৪-এর দিকে ‘রবীন্দ্র-সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় একদিন তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে আমার লেখাটি বেশ ভালো হয়েছিল। আমি নিউইয়র্কে চলে আসার পর তাঁর আরেক প্রিয় ছাত্র কবি মারুফুল ইসলামের সৌজন্যে প্রতি ফেব্রুয়ারিতে দেশে গেলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এবারও ২ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি যখন সভাপতিত্ব করছিলেন তখনও আমি উপস্থিত ছিলাম। পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্লাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হল, কথাও হল সামান্য। সেটাই ছিল শেষ দেখা।

তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ সাহচর্য ও সামাজিক নানা ভূমিকার সূত্রে অনুভব করেছি কখনো তাঁর ভূমিকা থেকেছে আমাদের

ভাবনানুকূল, কখনো-বা আমাদের প্রত্যাশার বাইরে। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে গিয়ে আমরা আমাদের চিন্তাকে যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেটাই আমার মনে হয় শিক্ষক হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের প্রাপ্তি।

৮

শিক্ষক হিসেবে, লেখক হিসেবে, সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁর বিচিত্র ভূমিকার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলো তাঁর নামকে গণমাধ্যমের কাছে যতটা প্রিয় করে তুলেছে ততটা তাঁর কাজ সম্পর্কে সমাজকে অবহিত করতে পারেনি। তাঁর অতি প্রিয় নিকটজনের সঙ্গে কথা বলেও দেখেছি বাংলাদেশের জ্ঞানগত ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কোথায় সে সম্পর্কে সামান্যই অবহিত তাঁদের বেশিরভাগ মানুষ। অন্তত তাঁর সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যগুলো জানার উপায় থাকলে কেউ তাঁকে গভীরতরভাবে অনুধাবন করতে চাইলে তা করা যাবে। সেজন্য তাঁর কর্মজগত সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত থাকা দরকার।

দীর্ঘ ও সক্রিয় ছিল আনিসুজ্জামানের জীবন। তাঁর মতো কর্মী মানুষের জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার সামর্থ্য অর্জনের জন্য আরও কিছু সময় দরকার। এই রচনায় তাঁর কর্মজীবনের একটা অসম্পূর্ণ সারসংক্ষেপ হয়তো উপস্থাপন করা গেল; হয়তো সামান্য পরিচয় দেয়া গেল তাঁর চিন্তার ও কর্মধারার। কিন্তু দেশের জন্য তাঁর অবদানের মূল্যায়নে প্রয়োজন তাঁর রচনাকর্মের অভিনিবিষ্ট পাঠ। পর্যালোচনা করা দরকার তাঁকে

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্ভাব্য জায়গা খোঁজ করে ফেরার পথে চা-পান বিরতি। বাঁ থেকে কবি মারুফুল ইসলাম, স্থপতি ফরহাদুর রেজা, শিল্প-সমালোচক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, শিল্পী রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও লেখকের সঙ্গে

নির্মোহ ভাবে। ক্রমে নিশ্চয়ই সে-কাজ এগিয়ে চলবে। তাঁর কর্মজীবন পরিভ্রমণের সুবিধা হবে বিবেচনা করে তাঁর একটা কর্ম-পরিচয়পঞ্জিও এই রচনার শেষে যুক্ত করে দেয়া হল।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

গবেষণা ও প্রবন্ধ

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪), *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৯৬৯), *স্বরূপের সন্ধানে* (১৯৭৬), *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India official Library and Records* (১৯৮১), *Social Aspects of Endogenous Intellectual Creativity* (1983), *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮৩), *পুরোনো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪), *Creativity, Reality and Identity* (১৯৯৩), *Cultural Pluralism* (1993), *Identity, Religion and Recent History* (1995), *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর* (১৯৯৮), *আমার চোখে* (১৯৯৯), *বাঙালি নারী: সাহিত্যে ও সমাজে* (২০০০), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০০), *পূর্বগামী* (২০০১), *কাল নিরবধি* (২০০৩), *রবীন্দ্রনাথ: একালের চোখে* (২০১১), *বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য* (২০১২), *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য* (২০১২) [কলকাতা], *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক* (২০১৩), *বিপুলা পৃথিবী* (২০১৫), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (২০১৫), *বাঙালি ও বাংলাদেশ* (২০১৬) [কলকাতা], *তাঁর সৃষ্টির পথ* (২০১৬), *সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি* [দশটি বক্তৃতা] (২০১৯)। এর মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বই দু-টি এবং আরও দু-একটি বই তাঁর পূর্ব প্রকাশিত বই থেকে নির্বাচন করা রচনার বিষয়ভিত্তিক নতুনতর উপস্থাপনা।

জীবনী

মুনীর চৌধুরী (১৯৭৫), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী* (১৯৮৮)।

স্মৃতিকথা

আমার একাত্তর (১৯৯৭), *কাল নিরবধি* (২০০৩), *বিপুলা পৃথিবী* (২০১৫)।

ছোটোদের জন্য লেখা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৮৩), *কত কাল ধরে* (২০০০), *আবদুল্লাহ আল মুতী* (২০১০), *কথার কথা* (২০১৭)।

বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ

অস্কার ওয়াইল্ডের *An Ideal Husband*-এর বাংলা নাট্যরূপ *আদর্শ স্বামী* (১৯৮২), আলেক্সেই আরবুঝভের *An Old World Comedy*-র বাংলা নাট্যরূপ *পুরনো পালা* (১৯৮৮)।

গ্রন্থ: একক ও যৌথ সম্পাদনা

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ স্মারকগ্রন্থ ; মুহম্মদ আবদুল হাই ও রফিকুল ইসলাম সহযোগে (১৯৬৩), *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৮), *বিদ্যাসাগর-রচনা সংগ্রহ* (যৌথ, ১৯৬৮), *দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ* (১৯৬৮), *এর উপায় কি?*, [মূল: মীর মশাররফ হোসেন] (১৯৭৪) *Culture and Thought* (যৌথ রচনা: আনোয়ার আবদেল মালেক সহযোগে, ১৯৮৩), *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী ১-৪ খণ্ড* (১৯৮২, ১৯৮৪, ১৯৮৪, ১৯৮৬), *যোগেশ-স্মৃতি: অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহ স্মারকগ্রন্থ*

(বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য ও অরুণ দাশগুপ্তের সহযোগে, ১৯৮৫), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড* (আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ ও অন্যান্য সহযোগে, ১৯৮৭), *ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান* (ওয়াহিদুল হক, জামিল চৌধুরী ও নরেন বিশ্বাস, ১৯৮৮), *অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯০), *স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন* (১৯৯২), *পাঠ্য বইয়ের বানান* (যৌথ সম্পাদনা জামিল চৌধুরী, বশীর আল হেলাল ও মাহবুবুল হক সহযোগে; সংকলক: হায়াৎ মামুদ, ১৯৯২), *শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদনা-পরিষদ, ১৯৯৩), *SAARC: A People's Perspective* (1993), *Creativity, reality, and identity* (1993), *নজরুল রচনাবলী প্রথম-চতুর্থ খণ্ড*, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সহযোগে [তিনি সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি] (১৯৯৩), *শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা* (১৯৯৫), *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচনাবলী* (১-৩ খণ্ড, ১৯৯৪-১৯৯৫), *নারীর কথা* (যৌথ, ১৯৯৪), *ফতোয়া* (যৌথ, ১৯৯৭), *মধুদা* (যৌথ, ১৯৯৭), *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী* (১ম খণ্ড, যৌথ ২০০১), *Art of Bangladesh Series-8: Devdas Chakrabarty* (2003), *ওগুস্তেঁ ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দসংগ্রহ* (যৌথ ২০০৩), *আইন-শব্দকোষ* (যৌথ, ২০০৬), *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল: জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল ও আবুল মোমেন সহযোগে (২০০৯), *Bangladesh: Six Decades 1947-2007* (যৌথ, ২০১০), *খান সারওয়ার মুরশিদ সংবর্ধনাগ্রন্থ* (২০১০), *রবীন্দ্রনাথ: এই সময়ে* (২০১২), *মুক্তির সংগ্রাম* (২০১২), *সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ: বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি* [বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা থেকে

প্রকাশিত] (২০১২), *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* (পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১২), *জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাক স্মারকগ্রন্থ* (২০১২), *Festivals of Bangladesh* (যৌথ, ২০১৬), *বাংলাভাষার প্রয়োগ অপপ্রয়োগ* (যৌথ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮), বাংলা একাডেমি, ঢাকা; *পাঠ্য বইয়ের বানান* [বশীর আল হেলাল, জামিল চৌধুরী ও মাহবুবুল হক সহযোগে], সংকলক: হায়াৎ মামুদ (১৯৮৮)।

অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের সাহিত্যকীর্তি গ্রন্থমালার আওতায় তাঁর পরিকল্পিত ২৪টি বইয়ের মধ্যে ২০ বইয়ের ভূমিকা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই ২০টি বই নিম্নরূপ:

টেকচাঁদ ঠাকুরের *আলালের ঘরের দুলাল* (২০০৯), কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (২০০৯), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কল্পতরু* (২০০৯), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *কঙ্কাবতী* (২০০৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা* (২০০৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কৃষ্ণকান্তের উইল* (২০০৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* (২০০৯), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* (২০০৯), কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* (২০০৯), মোহাম্মদ নজিবর রহমানের *আনোয়ারা* (২০১২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* (২০০৯), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (২০০৯), তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *স্বর্ণলতা* (২০১২), রমেশচন্দ্র দত্তের *বঙ্গবিজেতা,* কাজী নজরুল ইসলামের *মৃত্যুক্ষুধা* (২০১১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* (২০১২), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *নীলাঙ্গুরীয়* (২০১২), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রত্নদ্বীপ* (২০১২)।

তাঁর রচিত বা যৌথভাবে সম্পাদিত আরও কোনো কোনো বইয়ের নাম বাদ পড়ে থাকতে পারে। যেসব সিরিজ গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা

করেছেন সেগুলোর কোনোটির কথাও হয়তো এখানে উল্লিখিত হয়নি; আবার তাঁর রচিত কোনো কোনো সেমিনার-পত্রের নামও এখান থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

স্মারক বক্তৃতা

এশিয়াটিক সোসাইটিতে (কলকাতা) ইন্দিরা গান্ধী স্মারক বক্তৃতা (১৯৯১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা (?), নেতাজী ইনস্টিটিউট অভ এশিয়ান অ্যাফেয়ার্সে নেতাজী স্মারক বক্তৃতা (?), অনুষ্টুপের উদ্যোগে সমর সেন স্মারক বক্তৃতা (?) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ স্মারক বক্তৃতা প্রদান (১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)।

সমাবর্তন বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১ তম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান (৬ অক্টোবর ২০১৮)।

পুরস্কার ও সম্মাননা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক (১৯৫৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যানলি ম্যারন রচনা পুরস্কার (১৯৫৮), পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০), অলক্ত পুরস্কার (১৯৮৩), বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক (১৯৮৫), নির্বাচিত বাংলা কবিতা গান ও নাট্যাংশের ১৪টি ক্যাসেট সমন্বিত অডিও উপস্থাপনা 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' প্রকাশনার জন্য কলকাতার 'আনন্দ পুরস্কার' (১৯৯৪), ৭৭তম 'নিখিল ভারত বঙ্গ

সাহিত্য সম্মেলন’ ২০০৪-এ কথাসাহিত্য অধিবেশনের সভাপতিত্ব, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট (২০০৫), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু পুরস্কার (২০০৮), কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বর্ণপদক (২০১১), ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল পুরস্কার-২০১২ (*বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য* বইয়ের জন্য), ভারত সরকারের পদ্মভূষণ পদক (২০১৪), বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৫, স্টার আজীবন সম্মাননা (২০১৬), আত্মজীবনীমূলক বই *বিপুলা পৃথিবী*-র জন্য আনন্দ পুরস্কার ১৪২৩ (২০১৭), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক (২০১৮), শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য খান বাহাদুর আহছানউল্লা স্বর্ণপদক (২০১৯), সার্ক কালচারাল সেন্টারের সার্ক সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯।

তথ্যসূত্র

- উইকিপিডিয়া
- Wikiwand
- গুণীজন ওয়েবসাইট
- Cultural Pluralism, Anisuzzaman, The Asiatic Society, Kolkata, Second Reprint 2016
- ‘বইয়ের দেশ’, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ [ওয়েব পোর্টাল ‘তীরন্দাজ’ উদ্ধৃত পাঠ]
- Padma awardees 2014
- www.thedailystar.net
- www.prothomalo.com

- www.samakal.com
- www.bhorerkagoj.com
- www.kalerkantho.com
- www.banglatribune.com
- www.deshrupantor.com
- www.priyo.com
- rokomari.com
- www.boibazar.com
- bengalbarota.com
- *আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা-স্মারক*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত (২০০৫)
- *আনিসুজ্জামান: দীপ্র মনীষা* [সাক্ষাৎকার সংকলন], মাজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ্ নাসের সম্পাদিত (২০১৫)
- *আনিসুজ্জামান সম্মাননাগ্রন্থ*, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও অন্যান্য (২০১৭)
- *আলাপে ঝালাতে: শিল্পের সাহিত্যের আলাপন*, সাজ্জাদ শরিফ (২০১৯)

আলোকচিত্রগুলি লেখকের সংগ্রহ থেকে ব্যবহৃত।

লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও 'বইয়ের জগৎ' পত্রিকার সম্পাদক।

মহীবুল আজিজের বিয়ের অনুষ্ঠানে আড্ডায় চারজন: আনিসুজ্জামান,
বদরুদ্দীন উমর, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও আনু মুহাম্মদ
আলোকচিত্র: শৈবাল চৌধুরী

ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে পদ্মভূষণ পুরস্কার গ্রহণকালে
চিত্রসৌজন্য: ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

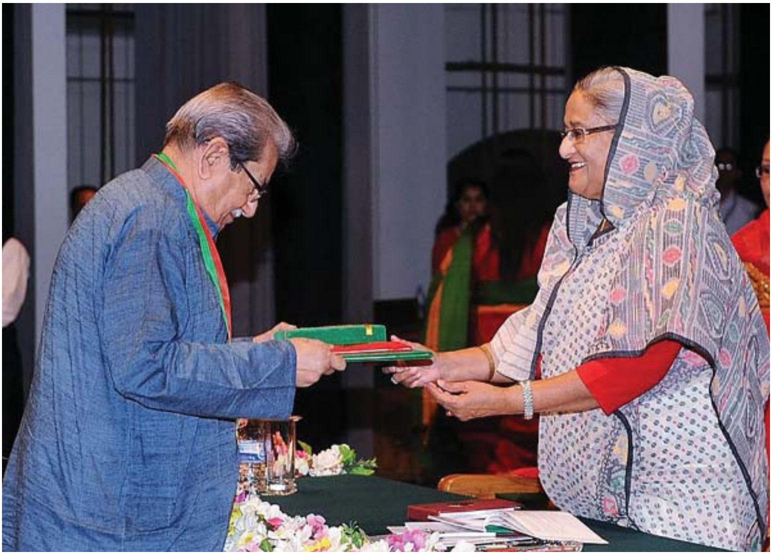

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন
চিত্রসৌজন্য: উইকিপিডিয়া

প্রকাশিত